মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৬

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

জুলাই ২০১৪ইং, রমাজান ১৪৩৫হি:,আষাঢ় ১৪২১বাং

رمضان المبارك ١٤٣٥ يوليو ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
দরসে ফিকহ
যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল..... **৫**
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১০
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত :
ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত **১১**
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাকের শরয়ী বিধান..... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
রোযা, তারাবীহ, লাইলাতুল কদর
তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল **১৬**
মুফতী নুর মুহাম্মদ
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৬..... ২৫
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
বিত্‌র নামাযের সঠিক পদ্ধতি..... ২৮
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৩.. ৩৪
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার .. ৪০
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

মাহে মুবারকের বরকতে ধন্য হোক মুসলিম উম্মাহ

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মৌসুম বসন্ত। আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জগতের বসন্ত হলো, রমাজানুল মুবারক। কত বড় সৌভাগ্য, এই বসন্তের পুনরাগমন ঘটছে আমাদের জীবনে। অনেকেই আজ বাসন্তিক হাওয়ার এমন অপূর্ব স্বাদ থেকে বঞ্চিত। বসন্তের দোরগোড়ায় এসেও অনেকের ঠিকানা এখন না ফেরার দেশে। আল্লাহ তাদের আরো উত্তম জাযা দান করুন। আমরা যারা আল্লাহর অপার করুণায় রমাজানুল মুবারকের রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের মৌসুমে জীবিত আছি, দেখতে হবে এর মূল্যায়নে কতখানা আত্মনিবেদন করতে পারছি। এর চিরন্তন আভায় কী পরিমাণ উজ্জীবিত-উদ্দীপ্ত হতে পারছে আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎ। কতটুকু স্নাত হতে পারছি আল্লাহর করুণা ঝর্ণায়।

রমাজান মাস আগমন উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"তোমাদের মাঝে রমাজান আগমন করছে, এই মাস বড়ই মুবারক মাস। এই মাসের রোযা আল্লাহ তা'আলা ফরজ করে দিয়েছেন। এই মাসে জান্নাতের দরজা খোলা হয়। দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অহংকারী শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার রাতের চেয়ে উত্তম। যে এর বরকত থেকে বঞ্চিত, মনে রেখো সে বঞ্চিত-হতভাগা। (নাসায়ী কিতাবুস সাওম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন,

'মাহে রমাজানের আগমন উপলক্ষে সারা বছর জান্নাতকে সাজানো হয়। রমাজান আগমনের পর জান্নাত বলে থাকে হে আল্লাহ! এই মাসে আপনার বান্দাদেরকে আমার জন্য খাস করে দেন। (বায়হাকী শু'আবুল ঈমান)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম) রমাজান মাস এলে কল্পনাতীত মেহনত মুশাক্কাতে দিন কাটতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রমাজান মাস এলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম) কোমর বেঁধে নিতেন এবং কল্পনাতীত মেহনত ও পরিশ্রম করতেন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে।

রমাজান মাস গুনাহমুক্ত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "রমাজানে মাসে যে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদত করবে সে এমনভাবে গুনাহমুক্ত হবে, যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। (নাসায়ী কিতাবুস সাউম)

মাহে রমাজানের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, এ মাসের হক আদায় করতে পারা মানুষের জন্য ইহ-পারলৌকিক জীবনের এক অদ্বিতীয় ও অনন্য বিশাল অর্জন। এই কারণে আমাদের আকাবিরগণ রমাজান মাসকে কাজে লাগিয়ে এর হক আদায় করার জন্য সর্বক্ষণ ইবাদত ও তেলাওয়াতে মশগুল থাকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। আকাবিরদের অনুকরণে এ দেশের শীর্ষ মুরব্বি ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বরকাতুহুম)-এর তত্ত্বাবধানে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় হাজারো উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমের উপস্থিতিতে বিশেষ ব্যবস্থায় মাহে রমাজানের বরকত হাসিলের চেষ্টা করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার জিম্মাদার, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং উস্তাদগণ হুজুরের সুহবতে থাকার জন্য প্রতি রমাজানেই মারকাযে একত্রিত হন। আবার দ্বীনি ইলমপিপাসু দূর-দূরান্তের বহু ছাত্রও এই জমায়েতে যোগ দিয়ে থাকে। এক জমা'আত থাকে চল্লিশ দিনের ই'তিকাফকারী। আরেক জমা'আত থাকে ৩০ দিন বা ১৫ দিনের ই'তিকাফকারী। আবার বিশ রমাজানের পর আশারায়ে আখীরার ই'তিকাফকারীদের একটি জমা'আত হয়ে থাকে। তাদের জন্য বিভিন্ন ইসলাহী প্রশিক্ষণ ও বয়ানের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের জন্য তাসহীহে কুরআন, নাহু, সরফ এবং ফেরাকে বাতেলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

মারকাযের আসাতেজা, ছাত্রগণ আত্মতৃপ্তির সাথে স্বেচ্ছায় এই জমা'আতের খেদমতে সর্বক্ষণ তৎপর থাকেন।

মাহে রমাজানে ওলামায়ে কেরাম এবং তালিবে ইলমদের এই বিশাল জমায়েত, তাদের ইবাদাত, তিলাওয়াত, যিকির এবং দু'আর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা বর্তমান সময়ে এক বিরল মানযার। যেন হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.)-এর খানেকাহের প্রতিবিম্ব।

পুরো মুসলিম বিশ্ব রমাজানের বরকতে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত হোক, সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহর আদর্শ চর্চিত হোক এবং সলফে সালেহীনের মতো রমাজানের হক আদায় করে তা থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হতে সক্ষম হোক–এই প্রার্থনায় ...।

মুফতী জামালুদ্দীন সাহেবের ইন্তিকালে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দা.বা.)

তিনি আমাদের মাঝে সর্বাধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী জামালুদ্দীন সাহেবের ইন্তিকালোত্তর এক প্রতিক্রিয়ায় মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচলক এ দেশের শীর্ষ মুরব্বি ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) বলেন, মুফতী জামালুদ্দীন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং পুত্রপ্রতিম ছিলেন। দীর্ঘ ২২ বছর আমাদের সাথে থেকে দ্বীনি বিভিন্ন খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তাকওয়া, পরহেজগারী, জুহুদ এবং গাম্ভীর্যতায় ছিলেন অতুলনীয়। আল্লাহর হুকুম ছিল, অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুনিয়াবীভাবে তাঁর বিদায়ে মর্মব্যথা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। আমাদের কাজ হলো দু'আ করা। আমরা দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের উচ্চাসনে স্থান দেন, তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, ভক্ত ও আমাদেরকে সবরের তাওফীক দান করেন। আমীন

উল্লেখ্য, মাওলানা মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব গত ২০ জুন ১৪ জুমুআর সময় ইন্তিকাল করেন।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। (সূরায়ে যুমার ২৩)

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করেছেন, যা তিনি স্বীয় রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব, যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এর আয়াতগুলো একে অপরের সাথে মিল রাখে। এই সূরার আয়াতগুলো ওই সূরার সাথে এবং ওই সূরার আয়াতগুলো এই সূরার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। একই কথা ও একই আলোচনা কয়েক জায়গায় রয়েছে। আবার অনৈক্যভাবে কতগুলো আয়াত একই বর্ণনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে সাথে ওর বিপরীতটির বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। যেমন মুমিনদের বর্ণনার সাথে সাথেই কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি। দেখা যায় যে, পুণ্যবানদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ইল্লীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা আছে, আল্লাহভীরুদের বর্ণনার সাথেই রয়েছে খোদাদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। مثـــانـــى এর অর্থ এটাই। আর متشابهات ওই আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ তো এটাই। এর যেখানে واخـر متشبهٰت (৩ :৭) রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্বিত হয়। সুতরাং তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শুনে আর ওরা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে। এই মহান লোকগুলো কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে আরো মজবুত করে, আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা কুরআনের আয়াত শুনে আরো বেশি কুফরী করতে শুরু করে। এরা সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকে, আর ওরা হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)

অর্থাৎ মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই তারা নির্ভর করে। যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (আনফাল ২-৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

"যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধিরসদৃশ আচরণ করে না। (ফুরকান ৭৩) বরং তারা কান লাগিয়ে শুনে এবং অন্তর দিয়ে অনুধাবন করেন। চিন্তা গবেষণা করে তারা সঠিক অর্থ জেনে নেয়। সঠিক অর্থ জেনে নিয়ে তারা সিজদায় পড়ে যায় এবং আমলের জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা কাজ করে, অন্যদের দেখাদেখি তারা অজ্ঞতার পেছনে পড়ে না।

অন্যদের বিপরীত তাদের মধ্যে তৃতীয় গুণ এই আছে যে, তারা কুরআন শ্রবণের সময় অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিলাওয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরামের দেহ ও আত্মা আল্লাহর যিকরের দিকে ঝুঁকে পড়ত। তাঁদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হতো। কিন্তু এটা নয় যে, তাঁরা চিল্লায়ে-চেঁচিয়ে উঠতেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতেন। বরং তাঁরা শান্তশিষ্টভাবে, আদব-কায়দা রক্ষা করে ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর কালাম শুনতেন। এভাবে তাঁরা দেহমনে প্রশান্তি লাভ করতেন এবং এ কারণেই তাঁরা প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। আল্লাহর তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহর অলীদের বিশেষণ এই যে, কুরআন শুনে তাঁদের অন্তর মোমের মতো গলে যায় এবং তাঁরা আল্লাহর যিকরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়। আর তাঁদের চক্ষুগুলো হয় অশ্রুসিক্ত এবং দেহমন হয় প্রশান্ত।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

অন্যকে অগ্রাধিকার দান

عن سهل بن سعد قال جاء ت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة فقال القوم هى الشملة فقال سهل هى شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبى صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبى صلى الله عليه وسلم لعلى أكفن فيها

হযরত সাহল ইবনে সাঁদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে একটি চাদর (হাদিয়া দেওয়ার জন্য) নিয়ে এল এবং নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি চাদরটি আপনাকে পরিধান করাতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদরটি গ্রহণ করে গায়ে দিলেন। আর তখন তাঁর এমন একটি চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তিনি যখন এটা গায়ে দিলেন, তখন তার সহচরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চাদরটি তো খুবই সুন্দর! এটা আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা! (এই বলে তিনি চাদরটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।)

তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন তাঁর সাথীরা তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলল, তুমি এ কাজটি ভালো করলে না। তুমি তো দেখছ যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রয়োজনের মুহূর্তে চাদরটি গ্রহণ করেছেন। তার পরও তুমি এটা চেয়ে বসলে, অথচ তুমি জান যে, তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়েই দেন। ওই সাহাবী তখন উত্তরে বললেন, আমি তো কেবল এর বরকতের আশা করেছি। কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গায়ে পরিধান করেছেন। তখন আমার আশা যে, এটাই আমার কাফন হবে। (বুখারী)

وعن أبى هريرة قال :جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فقال :إنى مجهود .فأرسل إلى بعض نسائه فقالت :والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك ، وقلن كلهن مثل ذلك ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : -من يضيفه يرحمه الله . فقام رجل من الأنصار -يقال له أبو طلحة -فقال :أنا يا رسول الله ، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته :هل عندك شىء ؟ قالت :لا إلا قوت صبيانى .قال :فعللیهم بشىء ونوميهم فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل فإذا أهوى بيده ليأكل فقومى إلى السراج كى تصلحيه فأطفئيه ففعلت ، فقعدوا وأكل الضيف ، وباتا طاويين ، فلما أصبح غدا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমি ক্ষুধায় কাতর এক গরিব মানুষ। এ কথা শুনে তিনি তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠালেন (যে ঘরে খাওয়ার মতো কোনো জিনিস থাকলে এর জন্য পাঠিয়ে দাও।) সেখান থেকে উত্তর এল যে, ওই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে এ মুহূর্তে পানি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর ঘরে খবর পাঠালেন। সেখান থেকেও এই উত্তর এল। তারপর (এভাবে প্রতিটি ঘরেই তিনি এ কথা বলে পাঠালেন এবং) সবার পক্ষ থেকে একই উত্তর এল। এবার তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ লোকটির মেহমানদারী করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন। এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে আবু তালহা নামক এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি (একজন মেহমানকে খাওয়ানোর মতো) কিছু আছে? স্ত্রী উত্তর দিল, কেবল শিশুদের আহারের জন্য কিছু খাবার আছে, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। (এমনকি আপনার এবং আমার খাওয়ার জন্যও কিছু নেই।) আবু তালহা বললেন তুমি শিশুদেরকে কোনো কিছু দিয়ে মনোরঞ্জন করে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর মেহমান যখন ঘরে আসবে তখন এমন ভাব দেখাও যে, আমরাও তার সাথে খানা খাব। তারপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে (এবং খানা শুরু করে দেবে) তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় উঠে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। (যাতে ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এবং মেহমান বুঝতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খানায় শরীক আছি কি না) কথামতো স্ত্রী তাই করল এবং খাবারে বসলেন তো সবাই, কিন্তু খাবার কেবল মেহমানই খেয়ে গেল। এভাবে স্বামী-স্ত্রীয় উভয়ই ক্ষুধা নিয়েই রাত কাটিয়ে দিল। প্রভাত হলে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তার এবং তার স্ত্রীর নাম নিয়ে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অমুক বান্দা ও অমুক বান্দীর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে এবং তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

দরসে ফিক্বহ

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

১. যাকাতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ সম্পদ হতে নির্দিষ্ট একটি অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে মালিক বানিয়ে দেওয়াকে।

এভাবেও বলা যেতে পারে, যাকাত এমন হক তথা অধিকারের নাম, যা বিশেষ বিশেষ ধন-সম্পদে ফরজ হয় এবং বিশেষ শ্রেণীর লোক ও খাতে ব্যয় হয়।

২. হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম ফরজে আইন এবং এর অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।

৩. অনাদায়ে শাস্তি

ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়ীর জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর তা দ্বারা তাদের কপালে তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে তার মজা ভোগ করো। (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩৪,৩৫)

৪. যাকাত ফরজ হওয়ার ভিত্তি

যাকাত ফরয হওয়ার মূল ভিত্তি হলো, বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

৫. যাকাতের শর্ত

শর্ত দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

২. সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

এক. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং পরাধীন গোলাম বান্দীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দুই. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিম ও মুরতাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

তিন. বালেগ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। উল্লেখ্য, সদকায়ে ফিতর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপরও ওয়াজিব।

চার. বুদ্ধি ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া। অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

পাঁচ. ধন-সম্পদ যাকাতের উপযোগী হতে হবে। এ ধরনের সম্পদের একটি মৌলিক সূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্বর্ণ

২. রুপা

৩. দেশি-বিদেশি কারেন্সি

৪. ব্যবসায়িক পণ্য। (এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।)

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদি।

৬. গৃহপালিত পশু, যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে।

৭. খনিজ সম্পদ

ছয়. সম্পদ নিসাবের পরিমাণ হওয়া বা নিসাবের সমমূল্যের হওয়া।

নিসাবের বিবরণ

ক. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা = ৯৫.৭৪৮ গ্রাম প্রায়।

খ. রুপা ৫২.৫ তোলা = ৬৭০.২৪ গ্রাম প্রায়।

উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব নির্ধারণে স্বর্ণ-রুপা হলো পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনদের জন্য যেটি বেশি লাভজনক হবে, সেটিকেই পরিমাপক হিসেবে গ্রহণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং মুদ্রা ও পণ্যের বেলায় বর্তমানে রুপার নিসাবই পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, যার নিকট ৫২.৫ তোলা সমমূল্যের দেশি-বিদেশি মুদ্রা বা ব্যবসায়িক পণ্য মজুদ থাকবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (আহসানুল ফতোয়া ৪/৩৯৪, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৯)

সাত. সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা, অর্থাৎ সম্পদে অন্যের কোনো হক/অধিকার না থাকা এবং তাতে মালিকের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হওয়া। (আল মা'আইর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

আট. চন্দ্র মাসে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

উল্লেখ্য, চন্দ্রমাস হিসেবে যাকাত আদায়

করলে যাকাতের পরিমাণ হবে ২.৫%, সৌরবর্ষ হিসেবে দিলে যাকাত দিতে হবে ২.৫৮%।

শস্য, ফলমূল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং উৎপাদন ও উত্তোলন শর্ত। (আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

বি. দ্র. নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু এবং শেষে বিদ্যমান থাকা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে সম্পদের পরিমাণ কমে গেলে বা সমুদয় মাল হাতছাড়া হয়ে গেলে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হলে যাকাত দিতে হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে' ২/৫১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫৫)

নয়. ঋণমুক্ত হওয়া

উল্লেখ্য, ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ঋণ গ্রহণ করে তা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে তা দেখতে হবে। যদি ব্যয়ের খাত এমন কোনো পণ্য হয়, যা যাকাতের আওতায় পড়ে তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি ব্যয়ের খাত যাকাতের আওতায় না পড়ে।

(যেমন–কোম্পানির ইমারত, মেশিন, পরিবহন ইত্যাদি) তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে না। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত ওয়া তিজারত, পৃ. ৯৪)

দশ. হাজতে আসলিয়্যাহ থেকে অতিরিক্ত হওয়া। হাজতে আসলিয়্যাহ বলতে এমন প্রয়োজনকে বোঝানো হয়, যা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন–আহারীয় খরচপাতি। বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি। (আদ্দুর্‌রুল মুখতার ২/২৬২)

এগারো. সম্পদ বর্ধিষ্ণু হওয়া। অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব হওয়া। আর গবাদি পশু স্ব-বর্ধিত বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

যাকাত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

এক.

নিয়ত করা

নিয়ত করার সময়

ক. উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান কালে।

খ. নিয়তবিহীন প্রদান করলে উপযুক্তের হাতে মাল থাকাবস্থায়।

গ. নিজের ওকীলের হাতে সোপর্দ করার সময়।

ঘ. মূল নিসাব হতে যাকাতের পরিমাণ পৃথক করার সময়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮)

দুই.

উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৯)

৬. ব্যবসায়িক পণ্যের সংজ্ঞা

ব্যবসায়িক পণ্য বলতে স্থাবর-অস্থাবর ওই সব পণ্যকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উদ্দেশ্য। চাই সেটি মাল উৎপাদনের উপকরণ হোক বা উৎপাদিত পণ্য।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

ক. ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য রুপার নিসাবের সমমানের হতে হবে।

খ. পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

গ. পণ্য ক্রয় বা মালিকানা অর্জনের সময় ব্যবসার নিয়ত করা। ক্রয়ের সময় নিয়ত না করলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সময় নিয়ত করা।

ঘ. পণ্য ব্যবসার নিয়তের উপযোগী হওয়া (বাদায়েউস সানায়ে ২/২১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৭১০)

যাকাতের আওতাভুক্ত পণ্যসামগ্রী

১. সব ধরনের কাঁচামাল (বাজারদরে)

২. যেসব পণ্য কারিগরি পরিবর্তনসহ বা ছাড়া বিক্রির জন্য রাখা হয়। (বাজারদরে)

৩. উৎপাদিত পণ্য।

৪. প্রক্রিয়াধীন পণ্য, এ ক্ষেত্রে যেদিন যাকাত ওয়াজিব হবে ওই দিনের বাজার দর ধর্তব্য হবে। কোনো কারণে বাজারদর জানা সম্ভব না হলে খরচাসহ ক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে।

৫. গুদামে মজুদ পণ্য, বাজারদর বিবেচিত হবে।

৬. রাস্তায় আনার পথে যেসব পণ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পণ্য যে স্থানে বা যে স্থানের কাছাকাছি থাকবে, সেখানের বাজারদর ধর্তব্য হবে।

৭. যেসব পণ্য ক্রয় প্রতিনিধির কাছে ওকালতীর ভিত্তিতে রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও স্থানের বিবেচনায় দর নির্ণয় করে যাকাত দিতে হবে।

৮. ট্রেডমার্ক। বর্তমানে ট্রেডমার্কও একটি মূল্যমান সম্বলিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত। তাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেডমার্ক নিলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে।

৯. برامج الحاسوب সফটওয়্যার। বর্তমান সময়ে এটিও একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত সফটওয়্যারের যাকাত আদায় করতে হবে।

১০. প্যাকেজিং, কার্টনজাতকরণের উপকরণ। যদি তা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হয় এবং এর প্রভাব পণ্যের মূল্যের ওপর পড়ে তখন এসব উপকরণও যাকাতের আওতায় চলে আসবে।

১১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি।

১২. ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব জমি, ফ্ল্যাট, পরিবহন ইত্যাদি ক্রয় করা হয় সেগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে

না। তবে ভাড়া বাবদ যে অর্থ অর্জিত হবে, তা যাকাতের উপযোগী অন্যান্য আসবাবের সাথে যোগ হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৮)

১৩. শেয়ার, শেয়ার ক্রয় Dividend-এর জন্য হলে দেখতে হবে ক্রয়কৃত শেয়ার কোম্পানির কী পরিমাণ যাকাত উপযোগী ও অনুপযোগী সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। যার পক্ষে এটা জানা সম্ভব সে শুধুমাত্র যাকাতের উপযোগী সম্পদ অনুপাতে যাকাত আদায় করবে। যার জন্য এটা জানা অসম্ভব সে সতর্কতামূলক বাজারদরে শেয়ারের যাকাত আদায় করবে।

আর শেয়ার দ্বারা Capital gain উদ্দেশ্য হলে এটি ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর পূর্ণ মূল্যের যাকাত প্রদান করতে হবে। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত, পৃ. ৯৩-৯৪ আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৫)

১৪. ব্যাংক হিসাব ও লকারে যেসব অর্থ ও যাকাত উপযোগী সম্পদ জমা থাকবে সেগুলোর যাকাতও প্রদান করতে হবে। সুদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত দিতে হবে। এতে সুদ যোগ হবে না। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের সাথে মুনাফাও যোগ হবে। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৫. বন্ড, অভিহিত মূল্যের সাথে খরচাপাতিও যোগ হবে। তবে অর্জিত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এতে যাকাত আসবে না। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৬. সব ধরনের বিনিয়োগ সুকুক, যতটুকু সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে সে অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর ৩৫, পৃ. ৪৭৬)

১৭. স্বর্ণ-রুপার স্টক, আকার-আকৃতি যা-ই হোক না কেন।

১৮. Retention amount (মা'আঈর পৃ. ৪৭৬)

১৯. বায়নাপত্রে অগ্রীম যে অর্থের লেনদেন হয় এর যাকাত বিক্রেতাকে দিতে হবে। (মা'আঈর ৪৭৬)

২০. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু।

২১. সুকুকে মুকারাযা

২২. خيـــــار (option) কালীন পণ্যের যাকাত মালিকের ওপর ওয়াজিব। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৭)

২৩. বেচাকেনা সলম পদ্ধতিতে হলে মূল্যের যাকাত বিক্রেতা প্রদান করবে। ক্রেতার হস্তগত হওয়ার আগে পণ্যের বিধান ঋণের যাকাতের মতো। আর হস্তগত হওয়ার পর এর বিধান ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। যদি এর দ্বারা ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য হয়। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৪. ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান সলমের মতোই হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৫. ঋণের যাকাত

ক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়। অথবা অক্ষম কিন্তু ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিংবা অস্বীকার করে কিন্তু পাওনাদারের কাছে শরয়ী প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় পাওনাদার ওই অর্থ ফেরত পাওয়ার পর হিসাব করে বিগত দিনসমূহের যাকাত আদায় করবে।

খ. আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে কিংবা অস্বীকার করে এবং পাওনাদারদের নিকট কোনো শরয়ী প্রমাণও না থাকে এমতাবস্থায় যদি কোনো সময় এই ঋণ পাওনাদারের হস্তগত হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে এর যাকাত প্রদান করতে হবে। বিগত দিনের যাকাত দিতে হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ২/১০, আদ্দুররুল মুখতার ও শামী ২/২৬৬-২৬৭ আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৭২,২/৬৭৭)

যাকাতের পরিমাণ

১. স্বর্ণে	২.৫%
২. রুপায়	২.৫%
৩. দেশি-বিদেশি মুদ্রা	২.৫%
৪. ব্যবসায়িক পণ্য	২.৫%

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য ও ফলফলাদিতে ৫%

(আল মা'আঈর নং ৩৫)

যাকাতের রুকন

যাকাতের রুকন হলো, নিসাবের নির্দিষ্ট একটি অংশকে নিজের মালিকানামুক্ত করে যাকাত নেওয়ার উপযোগী কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া বা তার প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা। (বাদায়ে ২/৩৯)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। শরয়ী কারণ ছাড়া আদায়ে বিলম্ব করা গুনাহের কাজ। (শামী ২/২৭১-২৭২, ফতহুল কদীর ২/১৬৫-১৬৬)

কতবার আদায় করতে হবে

ক. স্বর্ণ, রুপা, মুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত বছরে একবার।

খ. শস্য ও ফলফলাদি যতবার উৎপন্ন হবে, ততবার। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৪)

অগ্রিম যাকাত প্রদান

ক. নিসাবের মালিক হওয়া ছাড়া অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. নিসাবের মালিক হয়ে বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (বাদায়ে ২/৫০)

সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে

ক. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর বিনা কারণে যে পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে ততটুকুর যাকাত মাফ হয়ে যাবে। পুরো ধ্বংস হলে পুরোটাই রহিত হয়ে যাবে।

খ. ইচ্ছাকৃত ধ্বংস বা নষ্ট করলে হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং পুরো হিসাব মোতাবেক যাকাত দিতে হবে। (ফতহুল কদীর ২/১৭৯)

হারাম মাল

ক. জাতিগত হারাম হলে, যেহেতু এটি শরীয়ত নিষিদ্ধ তাই এতে যাকাতের হুকুম জারি হবে না। যেমন : শূকর, মদ ইত্যাদি।

খ. বিশেষ কোনো কারণে হারাম। যেমন : স্বর্ণ-রুপার তৈরি মূর্তি। প্রকৃত মুমীনের জন্য এর আকৃতি মিটিয়ে দিয়ে স্বর্ণ-রুপার যাকাত প্রদান করা জরুরি।

গ. অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ। যেমন : চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি-হাইজ্যাক, সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি, গান-বাদ্য করে উপার্জিত সম্পদ ও শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত অন্য কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে, যেহেতু এই সম্পদগুলোর মালিক সে নয়, বিধায় তাকে এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। বরং এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শরীয়তের বিধান। বিহিত কারণে সম্ভব না হলে পুরো সম্পদ সদকা করে দিতে হবে। (শামী ২/২৯০-২৯১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৫৪)

সন্দেহজনক মাল

কোনো মালের ব্যাপারে হালাল নাকি, হারাম এ মর্মে সন্দেহ হলে কোনো বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সাথে আলোচনা করে সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাতের রুকন হলো উপযুক্ত কাউকে পরিপূর্ণভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে না দিয়ে লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা বিলিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। (সূরা তাওবা ৬০)

যাকাতের অর্থে ট্যাক্স প্রদান

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য আসমান-জমিনের। যাকাত নিখুঁত একটি ইবাদত। আর ট্যাক্স রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি জিনিস। অতএব, দুটিকে এক মনে করে যাকাতের অর্থ দ্বারা ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না। (শামী : ২/২৭০)

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে?

যেদিন আদায় করা হবে সেই দিনের পণ্য মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে। (শামী ২/২৮৬)

পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মালিকানা কখন লাভ হবে

কন্ট্রাক্ট F.O.B-এর ভিত্তিতে হলে মাল লোড হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা স্বত্ত্ব লাভ হবে। আর C.I.F-এর ভিত্তিতে হলে মাল বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৬)

যেসব জিনিসের যাকাত নেই

১. নিজেদের ব্যবহার্য ইমারত ভবন
২. অফিশিয়াল যাবতীয় আসবাব
৩. গুদামঘর
৪. কাজের স্বার্থে যেসব জিনিস ক্রয় করা হয় । যেমন : এসি, ফ্যান, এয়ারকুলার, কম্পিউটার ইত্যাদি।
৫. কারিগরি স্বার্থে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি।
৬. খুচরা যন্ত্রাংশ
৭. কোম্পানির স্বার্থে ক্রয়কৃত মালবাহী বা মানুষবাহী পরিবহন।
৮. ভাড়া দেওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি বা অন্য কিছু।
৯. কোম্পানির ভবন বা দফতর নির্মাণের জন ক্রয়কৃত জমি।
১০. কার্টন, প্যাকেজিংজাতীয় আসবাব, যা শুধুমাত্র পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয় করা হয়। বিক্রি বা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য নয়।
১১. পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব জিনিস এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে, এর কোনো অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন : জ্বালানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত সাবান ইত্যাদি।

বি. দ্র. এ-জাতীয় পণ্যের যতটুকু বছরের শেষ দিন মজুদ থাকবে তা অবশ্যই যাকাতের আওতায় পড়বে। শুধুমাত্র যতটুকু ব্যবহার হবে ততটুকুই বাদ যাবে। (মাআঈর ৪৭৮)

১২. পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কুকুর। (আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৫১)
১৩. Charitable fund ও Trust
১৪. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। (মা'আঈর ৪৭৩)
১৫. কোনো কন্ট্রাক্ট বাবদ যে অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়। (মা'আঈর ৪৭৯)
১৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য।(পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর যাকাত প্রদান করতে হবে তবে ওই পশুসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যাকাত দিতে হবে না।) (হিন্দিয়া ১/১৮০, আল মৌসু'আ ২৩/২৭৪)

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র বা 'মাসারিফ'

পবিত্র কোরআনে কারীমে আট ধরনের লোকদের যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন : ইরশাদ হচ্ছে –

প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীর, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তা ছাড়া দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক। (সূরা তাওবা ৬০)

কোরআনে উল্লেখিত আট ধরনের লোকদের মধ্যে এক প্রকার হলো অমুসলিমদের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাত দেওয়া। হযরত উমর (রা.)-এর জামানায় ইসলামের ব্যাপকতা লাভ ও মুসলমানদের ব্যাপক শক্তি অর্জিত হওয়ার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান রহিত করে দেন। ওই সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমরের এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট থাকে সাত ধরনের লোক, তারা কারা? এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ফক্বীর, ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, যদিও ওই ব্যক্তি কর্মক্ষম ও কর্মরতও হয়।

২. মিসকিন, ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মালিকানায় কোনো ধরনের সম্পদ না থাকে।

৩. আ'মেল তথা যাকাতের মাল সংগ্রহকারী; ইসলামী হুকুমতের বাইতুল মাল কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদেরকে সংগৃহিত যাকাতের সম্পদ থেকে বিনিময় প্রদান করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে কমিশন হারে যাকাত থেকে বিনিময় প্রদান কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়।

৪. গোলাম অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে আজাদ হওয়ার জন্য গোলামকে যাকাত প্রদান করা। বর্তমানে এই খাতটিও বিদ্যমান নেই।

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তি এই পরিমাণ ঋণী হলে যে ঋণ আদায় করার পর তার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না।

৬. আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তি, যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ না থাকলে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, ইমামগণের নিকট আল্লাহর রাস্তা বলতে নির্ধারিত খাতকে বোঝানো হয়েছে। তাই কোনো ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা বা অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর রাস্তায় আছি মনে করে যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত দাবী করার কোনো অবকাশ নেই।

৭. মুসাফির, কোনো ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোথাও সফরে এসে সম্পদ শূন্য হয়ে পড়লে, তাকে বাড়িতে পৌঁছতে পারে পরিমাণ যাকাত প্রদান করা। উল্লিখিত সব খাতে অথবা যেকোনো একটি খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এই খাতগুলো ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। চাই সেটি যতই ভালো কাজ হোক না কেন। তাই মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং কোনো প্রকল্প যেখানে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়–এমন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

সংশয় ও নিরসণ

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মাসারিফে যাকাত' বলা হয়। এটিও স্পষ্ট হয়েছে যে, যাকাত যাকে প্রদান করা হবে তাকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়েই দিতে হবে।

এ পর্যায়ে একটি সংশয়ের নিরসন প্রয়োজন। সেটি হলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। এর হুকুম কি হবে?

মূলত যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে থাকে তার মধ্যে কওমী মাদরাসাসমূহ অন্যতম। এসকল মাদরাসায় যাকাত নেওয়ার উপযোগী বহু ছাত্র পড়া লেখা করতে আসে। তাদের জন্যই মূলত এই যাকাত সংগ্রহ করা হয়। এবং তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওই সকল ছাত্রদেরকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। তাই যে সকল মাদরাসা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয় সে সকল মাদরাসায় যাকাত দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

রয়েগেছে অন্যান্য সংগঠন সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন সংগঠন এমনকি টিভি চ্যানেলও ইসলামের খেদমতের নামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের কাছে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের কোনো ক্ষেত্র থাকা স্পষ্ট নয়। তাই ওই সকল সংগঠন ও প্রকল্পে যাকাত প্রদানে সতর্ক থাকা জরুরী।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

ঈমানী শক্তি আবশ্যক :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা তাহরীম ৬)

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বোঝা গেল, নিজেকে এবং নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো ফরজ। যার পদ্ধতি এটাই যে, নিজেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধানাবলির ওপর আমল করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেও আমল করাবে। আর বিধানাবলির ওপর আমল নির্ভর করে ইলম ও কলবের শক্তির ওপর। কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সময় সহীহ ইলম না থাকার কারণে মহান আল্লাহর হুকুমসমূহের বিরোধিতা করা হয়। এই যেমন সাধারণত লোকজন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার সময় চিত করে শুইয়ে দিয়ে মুখটাকে কেবলার দিকে মুড়িয়ে দেয়। এটা তাদের ভুল বৈ কিছু নয়। হুকুম হলো মৃত ব্যক্তিকে ডান পাশ করে শোয়াবে যাতে তার বুক কিবলামুখী থাকে।

অনুরূপভাবে কিছুসংখ্যক মানুষ কবরের ওপর গোলাপজল কিংবা কেওড়াজল ছিটিয়ে দেয়! অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং উলামায়ে কেরাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এটা অপচয়ের শামিল এবং শরয়ী সীমারেখা লঙ্ঘন।

অনেকে কাফনে আতর লাগান। এটাকে আলেমগণ "মুর্খতা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কবরে চাটাই, কার্পেট বিছানো জায়েয নেই, তেমনিভাবে গোলাপজল, কেওড়াজল ছিটানো, কাফনে আতর লাগানোও জায়েয নেই।

অনেকে এক মুষ্ঠি থেকে কম দাড়ি রাখে, ইংরেজদের মতো চুল রাখে, ফুল অথবা মুক্তার তৈরি টোপর মাথায় বাঁধে, লোক দেখানো নিছক মানসিকতা নিয়ে বিবাহ-শাদিতে লোকজনকে দাওয়াত দেয় অথচ অন্যান্য গুনাহ হতে খুব পরহেয করে!! আবার অনেক সময় জানা থাকা সত্ত্বেও মানা হয় না। যেমন লোকেরা জানে, গান-বাদ্য শোনা গুনাহের কাজ। কিন্তু প্রথা হিসেবে বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এটার ব্যবস্থা করে। আর ওই প্রথার বিরোধিতা করার সাহসই করতে পারে না।

এক মুষ্ঠির কমে দাড়ি কর্তন করা, মহিলা ও বালিকাদেরকে ত্যাজ্য সম্পদ না দেওয়া, নামাযের জামা'আত ছেড়ে দেওয়া, নামায না পড়া, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, সুদ বা ঘুষ নেওয়া, কিংবা দেওয়া, জুয়া খেলা, ব্যভিচার করা, তাস ও দাবা খেলা, ঘুড়ি উড়ানো, বিবাহের সময় মাথায় টোপর লাগানো, নামডাক এবং মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে দাওয়াত করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ, এসব কমবেশি সবাই জানে। কিন্তু সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাওয়ার কারণে এগুলো থেকে বিরত থাকা অথবা বিরোধিতা করার হিম্মত হয় না। এটাকেই 'অন্তর ও হিম্মতের দুর্বলতা' বলে।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার কানুনের বিরোধিতা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দুটি কারণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়টি বিদ্যমান আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি।

গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ভুল সহীহ ইলম না থাকার কারণে হয়ে থাকে। যার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন স্থান থেকে হয়েছে। তাদেরকে দ্বীনের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারা আমল শুরু করে দেয়। কিন্তু ওই সব বিষয়, যেগুলো সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে সেগুলোতে তারা রেওয়াজের কারণে প্রভাবিত। সেসব বিষয়ও তাদের বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা ফিরে আসে।

শহরাঞ্চলের লোকজনের অধিকাংশ ভুলে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ হলো হিম্মতে দুর্বলতা, এর পাশাপাশি আকীদা-বিশ্বাসগত কিছু সংশয়-সন্দেহও এতে সহযোগীর ভূমিকা রাখে।

যখন আহকামের ওপর আমল না করার দুটি কারণ পাওয়া গেল তার চিকিৎসাও সহজ হয়ে গেল। সেটা হলো সহীহ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর কয়েকটি পদ্ধতি আছে।

১। নিজের ঘরে কোনো এক সময় দ্বীনি কিতাব শোনানোর অভ্যাস গড়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ : হায়াতুল মুসলিমীন, ইসলাহুর রুসূম, আগলাতুল আওয়াম, হুকুকুল ইসলাম, জাযাউল আমাল, ফুরুউল ঈমান, আশরাফুন নাসায়েহ ও আশরাফুল হেদায়াত ইত্যাদি।

২। নিজ মহল্লার মসজিদে অথবা এমন কোনো স্থান, যেখানে লোকজন একত্রিত হতে পারে, দ্বীনি কিতাব পনের-বিশ মিনিট করে দৈনিক কোনো এক সময় শোনানোর অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩. নিজ ঘরে সপ্তাহে এক দিন অথবা যখনই সম্ভব হয় ওয়াযের ব্যবস্থা করা।

৪. যারা জানেন না তারা যারা জানেন তাদের নিকট কিতাব শুনানোর জন্য আবেদন করবেন। দ্বীন শিখার ক্ষেত্রে লজ্জা করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর অহংকার যে একটি নিন্দনীয় ব্যাধি সেটা তো বলাই বাহুল্য।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

ফুযালাদের প্রতি মূল্যবান নসীহত

*** ফিকহ অতুলনীয়**

ইসলামী ফিকহ শুধুমাত্র গবেষণা ও রিসার্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো ইলম ও ফনের নাম নয়। বরং এটা তো স্বয়ংসম্পূর্ণ একমাত্র জীবন ও অর্থব্যবস্থার একটি আইন ও সংবিধানের নাম, যা হাজার বছর ধরে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে কার্যকর হয়ে আসছে। ফিকহ যেকোনো যুগে যেখানেই রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানের মর্যাদা লাভ করেছে, এর মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ের দাবিকে সামনে রেখে কিছু পরিবর্তন এবং সংযোজন হয়েছে। তাই তো দেখা যায়, ফিকহ সব সময় যুগের উন্নতি উন্নয়নের সাথে সঙ্গ দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে যুগে যুগে ফিকহও পেয়ে আসছে আল্লাহর মনোনীত এমন সব মহান ব্যক্তিদের খিদমাত, যাঁরা মানবজীবনের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মতো ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ব্যবসায় নীতিতেও যুগের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং ইসলামী ফিকহের তথ্যসমূহের তালিকায় নতুন নতুন অসংখ্য নমুনা ও বিশেষ বিশেষ দিকসমূহের সংযোজন করেছেন। তাই তো আজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের নিকট কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বাণী এবং ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণার আকারে যেসব ইলমের ভাণ্ডার মজুদ রয়েছে তা এমন সূক্ষ্ম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায় নীতি ও সংবিধানসম্বলিত, যার তুলনা ও নমুনা পৃথিবীর কোনো বিজনেস 'ল' তে পাওয়া যায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

*** শিল্প বিপ্লব**

অন্যদিকে দেখুন যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন হয় তখন বাণিজ্য জগতে ব্যবসায়িক কারবারসংক্রান্ত এমন অনেক ব্যবসায়ী পরিভাষা ও পদ্ধতি অস্তিত্ব লাভ করে, যা ধর্মীয় পথপ্রদর্শক উলামায়ে কেরামের জন্য একেবারেই নতুন, এমতাবস্থায় এ ধরনের মাসআলার সমাধানের জন্য বড় পরিসরে যৌথভাবে রিসার্চ ও গবেষণার প্রয়োজন। তেমনিভাবে এসব নতুন পরিভাষা ও পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে বুঝে শরয়ী বিধিবিধান নির্ণয় করাও সময়ের দাবি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আরবে উসমানী খেলাফতের পতন এবং উপমহাদেশে মুগল সাম্রাজ্যের দাফন হয়ে যাওয়ার কারণে নিত্যনতুন মাসআলার আহকাম ইস্তিম্বাতের কাজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং ফিকহী আহকামের মার্জিতকরণ ও শরয়ী বিধানের সাথে এ যুগীয় বিভিন্ন সমস্যার সমন্বয় সাধনের কাজ যৌথভাবে হওয়ার ধারাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

*** শিল্প বিপ্লবের পরিণাম**

শিল্প বিপ্লবের ফলে দুটি তিক্ত পরিণাম সমাজে ছায়া হয়ে রয়ে যায়।

১. ব্যবসায় নীতির ইসলামী দর্শন ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক এলাকা ছাড়া হয়ে কিতাবের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গের কাছেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী পরিভাষাগুলো অচেনা-অজানা ভিনদেশি ভাষায় পরিণত হয়।

২. ইলমে ফিকহ বলতে শুধুমাত্র কিছু বিষয়াদি সবকে পড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর ফিকহী আহকামের সাথে যুগীয় সমস্যাগুলোর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রায় শূন্যের কোটায় পৌঁছে যায়।

*** যোগ্য হয়েও অযোগ্য**

বর্তমানে দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে দু-একটি জমাতে আংশিকভাবে ফিকহুল মুআমালাত সম্পর্কে দরস তদরীস হয়ে থাকে। আল হামদুলিল্লাহ এর ফলে প্রতি বছর মাদরাসাগুলো থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ছাত্র ও ফারেগ হচ্ছে, যারা অন্যান্য ইলমের পাশাপাশি ফিকহের ব্যাপারেও ভালো পরদর্শী। এদের মধ্য থেকে অনেকে বিভিন্ন বড় বড় জামেয়াতে ফাতওয়ার ওপর বিশেষ কোর্সও করে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায় (শতভাগ বাস্তবও বটে) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিধানাবলির ব্যাপারে এমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ও গভীর ইলমের অধিকারী হতে পারে না, যেমন অন্যান্য বিষয়ে হয়ে থাকে।

*** অবনতির কারণ**

আমার দৃষ্টিতে এই অবনতির কারণ দুটি।

১. দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে নিত্যনতুন অর্থব্যবস্থা, ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলমান লেনদেনের পদ্ধতি এবং নতুন ব্যবসায়ী পরিভাষার শিক্ষার প্রতি উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে মোটেই আলোচনা হয় না বললেও আশা করি অত্যুক্তি হবে না।

২. দ্বীনি মাদারেসে ফিকহ বিশেষ করে ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে যে পরিমাণ পড়ানো হয় অর্থনীতির কমিউনিকেশনের এ যুগে নিঃসন্দেহে তা অপ্রতুল। অতএব অন্যান্য বিষয়বস্তু যেমন– ইফতা, হাদীস, তাফসীর ও কেরাতের মতো ইসলামী অর্থব্যবস্থার ওপর বিশেষ

কোর্স করার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব দেওয়া জরুরি এবং যুগের চাহিদাও বটে।

*** অর্থনীতি বিভাগের সূচনা**

যুগের চাহিদা ও উলামায়ে কেরামের অবহেলা এবং বিষয়টির গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের ওপর একটি উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের আশা মনের গহিনে লালিত হয়ে আসছিল। আর বাস্তবায়নের জন্য জগদ্বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শায়খুল ইসলাম মুফতী তকী উসমানী সাহেব (দা.বা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা পরামর্শ শুরু করি এবং তা অব্যাহত রাখি। অবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ১৪২৬ হি. মোতাবেক ২০০৫ ইং সনে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি বিভাগের পথচলার শুভ সূচনা করি।

*** সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ**

এক সময় ইসলামী অর্থনীতির বিশালায়তন, গুরুত্ব ও যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ করে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার অভিপ্রায় জাগ্রত হয়। কিন্তু জায়গার অভাবে তা হয়ে ওঠেনি। আল হামদু লিল্লাহ গত ২০০৯ ইং সনে বসুন্ধরা গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান 'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স'-এর নামে বসুন্ধরা রেসিডেনসিয়াল এরিয়ার জে-ব্লকে অতি মূল্যবান এক বিঘা জমি ওয়াকফ করেন। অতঃপর অসংখ্য উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ১০ জুলাই ২০০৯ ইং সালে বাদ জুমু'আ সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়। তবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে শাইখুল ইসলাম মুফতী তকী উসমানী সাহেব (দা. বা.)-এর পরামর্শক্রমে কয়েকজন উদীয়মান তরুণ আলেমকে তাঁর নিকট ইসলামী অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করি, কোর্স শেষে তারা দেশে ফিরে এলে ১৪৩০ হিজরীর শাওয়াল মাস মোতাবেক ১ অক্টোবর ২০০৯ ইং সালে রোজ বৃহস্পতিবার থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম চালু করি।

আলহামদু লিল্লাহ, প্রতিনিয়ত এর শিক্ষা ও পরিবেশের মান বেড়েই চলছে।

*** লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

ফিকহুল মুআমালাত আরম্ভ করা হয় যোগ্য এমন একদল মুফতী তৈরি করার উদ্দেশ্যে, যারা সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসায়ী মহল এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইলমী খিদমাত দ্বারা সুদমুক্ত হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত ও পথপ্রদর্শন করে ব্যবসায়িক আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে শরয়ী দিকনির্দেশনার বাস্তব প্রয়োগের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন। এই গুরুদায়িত্ব পালনে তাদের মধ্যে মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোই সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্সের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন :

১. অর্থনীতিসংক্রান্ত শরয়ী বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া এবং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লেখ করা বিভিন্ন علت (কারণ) حكمت (হিকমত) নিয়ে রিসার্চ গবেষণা করে যুগীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।

২. অর্থনীতির নতুন নতুন পরিভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা শিখা, বিজনেস কমিউনিটির বিশেষ বাগধারা ও তাদের ব্যবসায়ী পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং অনৈসলামিক দিকগুলো চিহ্নিত করে এর শরয়ী বিধান, পাশাপাশি শরয়ীতসম্মত এর বিকল্প প্রয়োগিক পদ্ধতি বাতলিয়ে দেওয়া।

৩. আধুনিক সব ধরনের ব্যবসায়ী পদ্ধতি, জরুরত, চাহিদা জানা ও বোঝা এবং দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী তৎপরতা (ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফাইন্যান্স) ও কার্যক্রমের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া।

৪. সুদবিহীন ব্যাংকিং, ট্রেড, অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং এবং তাকাফুলের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও বোঝা।

৫. অভিজ্ঞ উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে লেনদেন সংক্রান্ত কোনো বিষয়বস্তুর ওপর গবেষণামূলক কাজ করা।

৬. اصول الافتاء (ফাতওয়া প্রদানের মূলনীতি) অভিজ্ঞ উস্তাদ থেকে শিখে এর বাস্তবায়ন করা।

৭. কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করা।

*** নিসাব (সিলেবাস)**

শাইখুল ইসলাম তকী উসমানী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে কোর্সটি দুই বছর মেয়াদি করা হয়। এ সময়ের মধ্যে সর্বমোট বিষয়বস্তুর ওপর গবেষণামূলক কাজ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, যেকোনো শাস্ত্রের তাখাসসুস (Specialization) করা জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়।

ক. ওই শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান।

খ. শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর মার্জিতকরণ ও বিন্যাসকরণ।

গ. বিষয় বস্তুকে যুগোপযোগী, প্রয়োগিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

নিসাব (সিলেবাস) নির্ধারণে এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে সামনে রাখা হয়েছে। এর ফায়দাও আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

*** জোয়ার আসছে**

ফিকহুল মুআমালাতের গুরুত্ব আজ কারো বুঝে আসে না। কিন্তু মনে রেখো নয়তো লিখে রাখো, সামনে ফিকহুল মুআমালাতের জোয়ার আসছে। অন্যান্য অনেক ফনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে পারে; কিন্তু ফিকহুল মুআমালাতের প্রয়োজনীয়তা দৈনন্দিন বাড়তেই থাকবে।

অতএব বুঝে আসুক বা না আসুক কথা মতো আমল করো, ইনশাআল্লাহ মেহনত বিফলে যাবে না।

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাকের শরয়ী বিধান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দেয় তাহলে কয় তালাক হবে, এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ আছে।

১. শিয়াদের শাখা জা'ফরীদের মাযহাব হলো, এর দ্বারা কোনো তালাক হবে না। যেহেতু সালাফে সালেহীনের কারো থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়নি, তাই এই মাযহাব বাতিল। এ নিয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই।
(তাকমিলাহ ১/১১১, ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৯)

২. কোনো কোনো আহলে জাহের এবং ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়িম (রহ.)-এর মাযহাব হলো, এর দ্বারা এক তালাক হবে, যদিও তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

৩. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী, উসমান, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আমর, উবাদাহ বিন সামিত, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আসেম বিন উমর ও হযরত আয়েশা (রা.)সহ আরো অনেক সাহাবী এবং ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী (রহ.)সহ অধিকাংশ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের মাযহাব হলো, এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং অন্যত্র বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে মেলামেশা না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না।

তৃতীয় মাযহাবের দলিল :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! বলে দিন যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিও...যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন।' (সূরা তালাক ১-২)

এই আয়াতে তালাকের শরয়ী পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, এমনভাবে তালাক দেওয়া, যার পরে ইদ্দত আসে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ না রেখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা যদি না হয়, তাহলে সে নিজের ওপর জুলুমকারীও হবে না এবং স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার পথও বন্ধ হবে না। যেদিকে এই আয়াত ইশারা করছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন।' ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে পথ বের করার অর্থ হলো, ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকা, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দিলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করেছো, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েনা হয়ে গেছে। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করোনি যে আল্লাহ তোমার জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন।" (ই'লাউস্ সুনান ৭/৭০৮)

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। ওই মহিলা অন্যজনকে বিবাহ করলে সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী প্রথম জনের মত ওই মহিলার মধু আস্বাদন না করবে।' অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (সহীহ বুখারী, ৫২৬১)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এটা রিফা'আ বিন ওয়াহাবের ঘটনা, যে তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছিল, এটাই স্পষ্ট। রিফা'আ আল কুরাযীর ঘটনা নয়, যে তার স্ত্রীকে সর্বশেষ তালাক দিয়েছিল। যে ব্যক্তি উক্ত দুজনকে এক মনে করেছে সে ভুল করেছে, ভুলের উৎস হলো তালাকপ্রাপ্তা দুই মহিলাকে আব্দুর রহমান বিন জাবীর (রা.) বিবাহ করেছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৯/৫৮১)

৪. হযরত উয়াইমির (রা.) লি'আনের পর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীকে রাখি, তাহলে তার ওপর মিথ্যারোপ করেছি। এ কথা বলে তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। (বুখারী, ৫২৫৯)

আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) বলেন, কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখান থেকে উম্মত এটাই বুঝেছে যে, একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যদি উম্মতের এই বুঝ সহীহ না হতো তাহলে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই বলে দিতেন। (তাকমিলাহ ১/১১২), ই'লাউস সুনান ৭/৭০৬)

৫. হযরত হাসান বিন আলী (রা.) তার স্ত্রী আয়েশা বিনতে ফযলকে একসাথে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীর কথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, যদি আমি নানাকে (অন্য বর্ণনায় তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন) এ কথা বলতে না শুনতাম যে, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না বসা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না।" তাহলে অবশ্যই তাকে ফেরত নিতাম। (সুনানে বাইহাকী, হা. নং ১৪৯৭১)

৬. মাহমূদ বিন লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে যান। (নাসাঈ শরীফ, হা. নং ৩৪৩১) এখানে রাসূল (সা.)-এর রাগান্বিত হওয়াই তিন তালাক হয়ে যাওয়ার প্রমাণ। কেননা একসাথে তিন তালাক দেওয়া গুনাহের কাজ, এ গুনাহের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারাজ হয়ে ছিলেন।

৭. হযরত ইবনে উমর (রা.) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। এ হাদীসের শেষে আছে যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিতাম তাহলে কি তাকে ফেরত নিতে পারতাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তখন তো সে তোমার থেকে বায়েন (সম্পূর্ণ পৃথক) হয়ে যেত এবং তোমার গুনাহ হতো। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা. ৭৭৬৭)

৮. ওয়াকে' বিন সাহবান (রা.) বলেন যে ইমরান বিন হুসাইন (রা.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, ইমরান (রা.) উত্তর দিলেন, সে তার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছে এবং তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা. ১৮০৮৮)

৯. হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিয়েছে আর সে বলছে এর দ্বারা আমি খেল-তামাশা করেছি, হযরত উমর (রা.) তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, এক হাজার থেকে তোমার জন্য তিনটিই যথেষ্ট হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হা.১১৩৪০, সুনানে বাইহাকী হা. ১৪৯৫৭)

১০. মুহাম্মদ বিন ইয়াছ (রহ.) ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গ্রামের এক লোক তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার আগেই তিন তালাক দিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? ইবনে আব্বাস (রা.) আবূ হুরাইরা (রা.)-কে বললেন, আপনার কাছে একটি জটিল মাসআলা এসেছে, আপনি এর সমাধান দিন। আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, এক তালাক তাকে বায়েন করে দিয়েছে আর তিন তালাক তাকে হারাম করে দিয়েছে। যতক্ষণ না সে অন্যজনকে বিবাহ করে। ইবনে আব্বাস (রা.)ও অনুরূপ উত্তর দেন। (মুআত্তা ইমাম মালেক হা. ৬৫৯)

এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো, এ ছাড়া সাহাবা, তাবেঈ ও তাবেতাবেঈ থেকে আরো অনেক হাদীস ও ফাতাওয়া আছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইজমায়ে উম্মত :

১. হাফেজ ইবনে রজব (রহ.) বলেন, জেনে রেখো, কোনো সাহাবা কোনো তাবেঈ ও সালফে সালেহীনদের মধ্যে যাদের কথা হালাল-হারাম ও ফাতাওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়, তাদের কারো থেকে এ ধরনের সুস্পষ্ট কথা বর্ণিত হয়নি যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর এক শব্দে তিন তালাক দিলে এক তালাক ধরা হবে। (ই'লাউস সুনান ৭/৭১০)

২. ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, এক শব্দে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত। (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৮)

৩. ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, (তিনিও এক তালাকের প্রবক্তা) এক শব্দে তিন তালাক দিয়ে দিলে তালাক হওয়ার ব্যাপারে লোকদের চারটি মাযহাব আছে। প্রথমটি হলো, তিন তালাকই হয়ে যাবে, এটা চার ইমাম, অধিকাংশ তাবেঈ ও সাহাবাদের মাযহাব। (লাজনাতুত দায়িমাহ-এর উদ্ধৃতিতে আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৬৬)

৪. চার ইমামের মাযহাবের বিপরীত যা আছে, তা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। যদিও তাতে অন্যদের দ্বিমত থাকে। (আল-আশবাহ ওয়াননাযায়ের, পৃ. ১৬৯)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলিল ও এর জবাব :

১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রুকানা (রা.) তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিলেন এবং পরে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছো? তিনি বললেন, আমি তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন এক মজলিসে দিয়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, এটা এক তালাক, যদি চাও তাহলে তাকে ফিরিয়ে নাও। (মুসনাদে আহমাদ, ২৩৯১)

জবাব :

এই ঘটনার বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়, এখানে আছে যে তিনি তাকে তিন তালাক দিয়েছেন। আর আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় আছে যে 'বাত্তাহ' শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন। এই দুই ধরনের বর্ণনার কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসকে 'মা'লূল' বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। (তালখীসুল হাবীর, ১৬০৩)

ইমাম জাসসাস ও ইবনে হুমাম (রহ.) মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাকে 'মুনকার' বলেছেন। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ 'বাত্তাহ' শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে রাজেহ বলেছেন। কোনো বর্ণনাকারী এটাকেই তিন তালাক বুঝে সেভাবে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে ইবনে আব্বাসের পরবর্তী হাদীস দ্বারাও দলিল দেওয়া যাবে না। (ফাতহুল বারী ৯/৪৫৪, তাকমিলাহ ১/১১৫)

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে, আবূ বকরের যুগে ও খিলাফাতে উমরের প্রথম দুই বছর (কোনো বর্ণনায় তিন বছর) তিন তালাক এক তালাক ছিল। অতঃপর, হযরত উমর (রা.) বলেন, লোকেরা এমন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করছে যে বিষয়ে তাদের অবকাশ ছিল। হায়! যদি আমি তাদের ওপর তা কার্যকর করতাম। অতঃপর তিনি তা কার্যকর করলেন। (মুসলিম শরীফ : ৩৬৫৪)

জবাব :

ক. হাফেজ আবূ যুরআহ (রহ.) বলেন, এই হাদীসের অর্থ হলো, বর্তমানে লোকদের একসাথে তিন তালাক দেওয়ার যে প্রচলন দেখা যাচ্ছে, তা রাসূলের যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের দুই বছরে ছিল না। তখন লোকেরা সুন্নাত তরীকায় তিন তুহুরে তিন তালাক দিতেন। (সুনানে বাইহাকী : ১৪৯৮৪)

খ. আর যদি হাদীসের অর্থ এই হয় যে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে বর্তমানে তিন ধরা হয়, অথচ রাসূলের যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের প্রথম দুই বছর তা এক তালাক ধরা হতো। তাহলে এর উত্তর হলো :

এ মাযহাবের দুটি হাদীস, উভয়টি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। অথচ তার ফাতওয়া হলো, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যা দলিল নং ২ ও ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান, আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদিনীর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসীনের মাযহাব হলো, যখন কোনো রাবী তার হাদীসের বিপরীত আমল করে বা ফাতওয়া দেন, তখন তার বর্ণিত হাদীসটি আমলযোগ্য থাকে না। সুতরাং ইবনে আব্বাসের এই হাদীসদ্বয়ও আমলের যোগ্য নয়; বিভিন্ন আপত্তির কারণে তা অগ্রহণযোগ্য।
(ই'লাউস সুনান ৭/৭১৬)

গ. এই হাদীস একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, তা হলো যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক এবং বিচারকের সামনে দাবি করত যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলে প্রথমটির তাকিদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল; ভিন্ন তালাক উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে কাযী তার দাবি কবুল করতেন এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে এক তালাকের ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু হযরত উমরের যুগে লোকজন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দ্বীনদারী কমতে থাকে, তখন হযরত উমর (রা.) বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের দাবি কবুল না করার আইন কার্যকর করেন এবং ওই শব্দ দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেন, তথা তিন তালাক হওয়ার ফাতওয়া কার্যকর করেন। (তাকমিলাহ ১/১১৪, ফাতহুল বারী ৯/৪৫৬)

যদি তা-ই না হতো এবং উমর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্ত শরীয়তে মুহাম্মদীর বিপরীত হতো, তাহলে ইবনে আব্বাসসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম কখনোই তা মেনে নিতেন না। যেমন- উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা, এক দিনারকে দুই দিনারের মাধ্যমে বিক্রি করা এবং হজ্বে তামাত্তু-এর মাসআলায় হযরত ইবনে আব্বাস স্পষ্ট ভাষায় হযরত উমরের বিরোধিতা করেন। (আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৬৯)

যদি কেউ বলে যে, হযরত উমরের ভয়ে সাহাবারা তার প্রতিবাদ করেনি (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন ধারণা পুরো দ্বীনকে ভিত্তিহীন করে দেবে, যা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন যে, কারো জন্য এই ধারণা করা জায়িয নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের শরীয়ত পরিপন্থী কোনো বিষয়ের ওপর একমত হয়েছেন। (মাজমূআতুল ফাতাওয়া ১৭/২২)

সর্বশেষ কথা :

আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদেরকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা মদীনার আমল দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন, অথচ সৌদি সরকার কর্তৃক মক্কা-মদীনাসহ দেশের বড় উলামাদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে সৌদি সরকার যখন এ মাসআলার তাহকীক পেশ করার নির্দেশ দেয়, তখন তারা দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। (এ ঘটনা আহসানুল ফাতওয়ার পঞ্চম খণ্ডের ২২৫-৩৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।)

রোযা, তারাবীহ, লাইলাতুল কদর

তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী নুর মুহাম্মদ

রোযার ফজীলত :

রোযা শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোযার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগী থেকে রোযাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

যেমন তিনি এক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭৬০)

এ হাদীস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি, নেক আমলের মাঝে রোযা রাখার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি।

তাই সাহাবী আবু হুরাইরা (রা.) যখন বলেছিলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোনো নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তুমি রোযা রাখো। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই।' (নাসাঈ শরীফ ২৫৩৪)

রোযার এত মর্যাদার কারণ কী তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো জানেন। তবে, আমরা যা দেখি তা হলো, রোযা এমন একটি আমল, যাতে লোকদেখানো ভাব থাকে না, বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়। নামায, হজ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কে করল তা দেখা যায়। পরিত্যাগ করলেও বোঝা যায়। কিন্তু রোযার ক্ষেত্রে লোকদেখানো বা শোনানোর সুযোগ থাকে না। ফলে রোযার মধ্যে ইখলাস, আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা নির্ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

'রোযাদার আমার জন্যই পানাহার ও সহবাস পরিহার করে।' (মুসলিম শরীফ ২৭৬৩)

☆ রোযাদার বিনা হিসেবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হয় না। বরং প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে দশ গুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'মানবসন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।' (মুসলিম শরীফ ১৫৫১)

☆ রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল :

যেমন হাদীসে এসেছে,

'রোযা হলো ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।' (মুসনাদে আহমদ ৯২১৪)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এক দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে এক খরিফ (সত্তর বছরের) দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।' (মুসলিম শরীফ ২৭৬৯)

☆ রোযা হলো জান্নাত লাভের পথ

হাদীসে এসেছে,

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন, যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন,

'তুমি রোযা রাখো। কেননা, এর সমকক্ষ আর কোনো ইবাদত নেই।' (নাসাঈ শরীফ ২২২০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন,

'জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোযাদারগণই শুধু সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যখন তাদের প্রবেশ শেষ হবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে তারা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারী শরীফ ১৭৯৭)

☆ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

'যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।' (বুখারী শরীফ ১৭৯০)

☆ রোযাদারের আনন্দ

যেমন হাদীসে এসেছে,

'রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ : একটি হলো ইফতারের সময়, অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।' (মুসলিম শরীফ ১১৫১)

☆ রোযা কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'রোযা ও কুরআন কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, রোযা বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কুরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।' (মুসনাদে আহমদ ৬৬২৬)

☆ রোযা গুনাহ মাফের উপায় ও গুনাহের কাফফারা

হাদীসে এসেছে,

'মানুষ যখন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন-সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে, তখন নামায, রোযা, সদকা সে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।' (বুখারী শরীফ ১৭৯৫)

আর রমাজান তো গুনাহ মাফ ও মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

'যে রমাজান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (বুখারী শরীফ ২০১৪)

ইহতিসাবের অর্থ হলো : আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্টচিত্তে কোনো ইবাদত করা।

রোযার হিকমত, লক্ষ্য ও উপকারিতা

(১) তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি অর্জন।

(২) শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করা।

(৩) রোযা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

(৪) ঈমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার সুন্দর পন্থা।

(৫) ধৈর্য, সবর ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টির মাধ্যম।

(৬) নিজেকে আখেরাতমুখী করার অনুশীলন।

(৭) আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া ও সৃষ্টি জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৮) জাগতিকভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের উত্তম উপায়।

সাহরী খাওয়া :

রোযা রাখার জন্য সাহরী খাওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।' (বুখারী শরীফ ১৯২৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'আমাদের ও ইহুদি-খ্রিস্টানদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম শরীফ ২৬০৪)

☆ দেরি করে সাহরী খাওয়া :

সাহরীর অর্থ হলো, যা কিছু রাতের শেষভাগে খাওয়া হয়। সুন্নত হলো, দেরি করে সাহরী খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে সাহরী খেলে রোযা রাখতে অধিকতর সহজ হয়, ফজরের নামায আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহরী শেষ করা সুন্নত নয়। সাহরীর সময় শেষ হলো কি না তা জানার উপায় হলো স্বচক্ষে পূর্বাকাশের শুভ্রতা দেখা, অথবা নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডার ও নির্ভুল ঘড়ির মাধ্যমে অবগত হওয়া।

☆ ইফতারে বিলম্ব না করা :

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাতের আগমন ঘটে ও ইফতার করার সময় হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'মানুষ যত দিন পর্যন্ত সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন কল্যাণের সাথে থাকবে।' (বুখারী শরীফ ২৮৫২)

তিনি আরো বলেছেন,

'যত দিন মানুষ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, তত দিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইফতারে দেরি করে।' (আবু দাউদ শরীফ ২৩৫৫)

যে সকল খাদ্য দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব :

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না

পেলে তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুর না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।' (মুসনাদে আহমদ ১৩০১২)

☆ ইফতারের সময় দু'আ করা

রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়। কারণ ইফতারের সময়টা হলো বিনয় ও আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণের চরম মুহূর্ত। এ সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের মুহূর্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এটা রমাজানের প্রতি রাতে। প্রত্যেক রোযাদার বান্দার দোয়া কবুল হয়।' (বায়হাকী ৩৬০৫)

ইফতার করার পর এ দু'আটি পাঠ করা সুন্নত-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

অর্থ: 'পিপাসা নিবারণ হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নির্ধারিত হলো।' (আবু দাউদ শরীফ ২৩৫৭)

রোযা রাখা যাদের ওপর ফরজ

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকীম, সুস্থদেহী মুসলিমের জন্য রোযা রাখা ফরজ।

যে ব্যক্তি এ সকল শর্তাবলির অধিকারী তাকে অবশ্যই রমাজান মাসে রোযা রাখতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে।' (বাকারা ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'যখন তোমরা রমাজানের চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে।' (মুসলিম শরীফ ১০৮১)

রমাজানের শেষ দশকের ফজীলত ও তাৎপর্য

রমাজান মাসের শেষ দশকের বিশেষ ফজীলত রয়েছে এবং আছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন :

☆ এ দশ দিনের মাঝে রয়েছে কদর নামের একটি রাত যা হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে এ রাতে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অতীতের পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

☆ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে বেশি সময় ও শ্রম দিতেন, যা অন্য কোনো রাতে দেখা যেত না। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি এ রাতে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, নামায ও দু'আর মাধ্যমে জাগ্রত থাকতেন এরপর সাহরী গ্রহণ করতেন।

☆ রমাজানের শেষ দশক এলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। যেমন বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি এ দশ দিনের রাতে মোটেই নিদ্রা যেতেন না। পরিবারের সকলকে তিনি এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য জাগিয়ে দিতেন।

☆ এ দশ দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনগুলোতে মসজিদে ইতিকাফ করতেন। প্রয়োজন ব্যতীত তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন না।

তারাবীহর নামায ২০ রাক'আত পড়াই সুন্নাত :

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই তারাবীহ'র নামায বিশ রাক'আত আদায় করা হচ্ছে। পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোথাও এর কম পড়ার ইতিহাস নেই। সাহাবা ও তাবেঈনের যুগ এবং ইসলামের স্বনামধন্য সমস্ত ইমামগণ যথা : ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.) সবাই বিশ রাক'আত তারাবীহ'র পক্ষে ছিলেন। (আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা, ইমাম মালেক ১/১৯৩, মুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৬)

এতদসত্ত্বেও অধুনা বিশ্বে আহলে হাদীস দাবিদার কিছু লোক ৮ রাক'আত তারাবীহ নামক একটি মতবাদ রচনা করে জনমনে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। তাই ২০ রাক'আত তারাবীহর অসংখ্য দলিল-প্রমাণ হতে অতি সংক্ষেপে কিছু দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন :**

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে আবী শাইবা (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মুসান্নাফে লিখেন-

عن ابن عباس رضـ: أن رسول الله ﷺ كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر۔

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাজান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ ও বিত্‌র পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা

২/৩৯৪,৭৭৭৪)

উল্লেখ্য : আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস বা মুতাওয়াতির হাদীসের মতো বিশুদ্ধ বা প্রমাণযোগ্য। তাই হাদীসটি নির্দ্বিধায় আমলযোগ্য। তবে এ বিষয়ে চলমান বিশ্বের উদীয়মান তথাকথিত কিছু গবেষক মুসলমানদেরকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে।

তাই এসব চক্রান্ত থেকে রক্ষা পেতে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস কখনো দুর্বল হতে পারে না। তিনি যেমন মহান, তাঁর বাণীও মহান। তবে হাদীসের বর্ণনাকারীদের প্রতি লক্ষ করে হাদীসকে দুর্বল বা বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করা হয়। এ মর্মে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে যেমন দুর্বলতা লক্ষ করা যাবে হাদীসটি তেমনই দুর্বল বলে বিবেচিত হবে এবং হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কি না, এমন সংশয়ের সৃষ্টি করবে।

তবে যদি বর্ণনাকারীর দুর্বলতা ও সংশয় চলে যাওয়ার মতো কোনো কারণ ওই হাদীসের সনদে বা মতনে পরিলক্ষিত হয়, তখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এমনকি কারণ শক্তিশালী হলে কখনো কখনো দুর্বল হাদীসটি একপর্যায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়। (দেখুন : আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতে ইবনে ছালাহ/আসকালানী ১/৪৯৪, ফাতহুল মুগীস, সাখাবী ১/৩৩)

উপরোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, কারণ এই হাদীসটি সনদের বিবেচনায় দুর্বল। এতে আবু শাইবা নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এই হাদীসের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ কারণ রয়েছে। রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আমল এবং তাদের ইজমা বা ঐকমত্য। আর উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এ ধরনের দুর্বল হাদীসকে (الضعيف المتلقى بالقبول) দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও গৃহীত ও অনুসৃত বলা হয়।

এ বিষয়ে উলুমে হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী বহু উলামায়ে কেরামদের বর্ণনাসমূহ হতে একটি মাত্র উল্লেখ করা হলো। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) লিখেন,

إذاتلقته الامة بالقبول ولا شك ان إجماع الامة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق۔

যে হাদীস অনুযায়ী আমল করা উম্মতের নিকট গৃহীত হয়েছে এবং যে বিষয় অনুযায়ী আমল করার প্রতি উম্মতের ঐক্য (ইজমা) চলে আসছে, নিঃসন্দেহে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কারণ ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষাও শক্তিশালী। (আন নুকাত আলা কিতাবি ইবনে ছালাহ/ আসকালানী ১/৪৯৪)

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর অনুসৃত আদর্শ এবং তাঁদের উক্তি ও আমল ইলমে হাদীসের কিছু নিয়মনীতি ও শর্ত সাপেক্ষে জমহুর উম্মত ও চার মাযহাবের ইমাম মুজতাহিদগণের নিকট অনুস্মরণীয় তথা শরীয়তের যাবতীয় ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের সংস্পর্শে ধন্য তাবেঈগণের আমল ও উক্তিসম্বলিত বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিম্নে কিঞ্চিত প্রদত্ত হলো।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তারাবীহ যেভাবে পড়া হতো প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগেও সেভাবেই পড়া হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করে এতে কোনো পরিবর্তন বা সবাইকে এক ইমামের পেছনে জামা'আতবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে চলে আসা ২০ রাক'আত তারাবীহকে গুরুত্বের সাথে আদায় করেন এবং সবাইকে জামা'আতবদ্ধভাবে ইমামের পেছনে আদায় করার সুযোগ করে দেন।

১। সাহাবী হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন-

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطابؓ فى شهر رمضان بعشرين ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكئون على عِصِيّهم فى عهد عثمان بن عفانؓ من شدة القيام۔

তারা (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর যুগে ২০ রাক'আত পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তারা নামাযে ১০০ আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘ সময় নামাযের কারণে তাদের লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতে হতো। (আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ২/৪৯৬ (সনদ সহীহ)

২। অন্য এক সূত্রে সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.) বলেন,

كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر۔

আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর যুগে ২০ রাক'আত এবং বিত্‌র পড়তাম। (মা'রিফাতুস সুনানওয়াল আসার, বাইহাকী ২/৩০৫ ও আস সুনানুল কুবরা বাইহাকী ১/২৬৭-২৬৮ (সনদ সহীহ)

৩। আরেক বর্ণনায় তিনি বলেন,

كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة۔

আমরা উমর (রা.)-এর যুগে ফজরের কাছাকাছি সময়ে তারাবীহ'র নামায থেকে ফিরতাম। আর উমর (রা.)-এর যুগে তারাবীহ হতো (বিত্‌রসহ) ২৩ রাক'আত। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪/২৬১,৭৭৩৩ (সনদ নির্ভরযোগ্য))

৪। তাবেঈ রুফাই বিন মেহরান যিনি 'আবুল আলীয়া' নামে প্রসিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের মাত্র দুই বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেন, হযরত উমর (রা.)-এর পেছনে তিনি নামায পড়েছেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ উস্তাদ সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

ان عمر أمر أبيا ان يصلى بالناس فى رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤا فلوقرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا أميرالمؤمنين هذا(شئ)لم يكن فقال قد علمت ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة۔

হযরত উমর (রা.) হযরত উবাই (রা.) কে রমাজানে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেন এবং বললেন, লোকজন দিনভর রোযা রাখে, কিন্তু তারা সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে পারে না, তাই আপনি যদি রাতে তাদেরকে নামাযে কুরআন পড়ে শোনাতেন! তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! জামা'আতবদ্ধভাবে কুরআন শোনানোর এ পদ্ধতি তো পূর্বে ছিল না। তিনি বললেন, আমি জানি, তবে তা খুবই উত্তম। এরপর সাহাবী হযরত উবাই (রা.) লোকদেরকে নিয়ে ২০ রাক'আত পড়লেন। (আল মুখতারাহ জিয়াউদ্দীন মাকদিসী ৩/৩৬৭,১১৬১)

উল্লেখ্য : এখানে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবায়ন করেছেন, যা তিনি (বিধানটি ফরজ হয়ে যাবে এ ভয়ে) করেননি। হাদীসটির সনদ সহীহ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়নি এমন বিশুদ্ধ হাদীসের ভাণ্ডার ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদিসীর কিতাব "আল মুখতারাহ"-এ উল্লেখ করেছেন। ওই কিতাবের গবেষক আরব দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তি আব্দুল মালিক এ হাদীসটির সনদকে হাসান (উত্তম ও গ্রহণযোগ্য) বলেছেন। (আল মুখতারাহ ৩/৩৬৭ পার্শ্বটিকা) সহীহ হাদীস যেভাবে গ্রহণযোগ্য হাসান হাদীসও গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। এতে আলবানী সাহেবেরও দ্বিমত নেই।

৫। তাবেঈ হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী (রহ.)-এর বর্ণনা-

ان عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة۔

হযরত উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত পড়ার আদেশ করেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩, ৭৭৬৪)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিষয়ে আরো অগণিত বর্ণনা রয়েছে। এজন্যই বিশ্ববরেণ্য গবেষক আল্লামা যাহেদ আল কাউসারী (রহ.) লিখেছেন, কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার একটি কারণ হলো এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেঈগণের আসার (আমল-উক্তি) বেশি হওয়া। (ফিকহু আহলিল ইরাক (নাছবুর রায়াসহ ১/৪৯)

বলাবাহুল্য, ২০ রাক'আত তারাবীহ'র পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়ার একটি কারণ এটাও যে, এর পক্ষে তাবেঈগণের অনেক আসার (আমল-উক্তি) আছে। যেগুলোর তুলনায় ৮ রাক'আতের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো আসার নেই বললেই চলে।

বস্তুত : এ ধরনের বর্ণনাগুলো একাধিক হওয়ার কারণে এবং এর সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত আমল ধারা বিদ্যমান থাকার কারণেই বর্ণনাগুলো সহীহ বা সর্বাপেক্ষা সহীহ হাদীসের পর্যায়ে গৃহীত। এতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই। তাই তো আহলে হাদীসদের মান্যবর ইমাম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) ও নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন,

انه قد ثبت ان أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث۔

অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমাজানে লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১২-১১৩)

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর

যুগেও তারাবীহ'র নামায ইশার জামা'আতের পর ২০ রাক'আত জামা'আতবদ্ধভাবে পড়া হতো। হযরত সায়েব (রা.)-এর বর্ণনায় হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালের অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে উসমান (রা.)-এর যুগের পরিস্থিতিও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ আছে, যা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ করেছি।

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে তারাবীহ :

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর যুগেও তারাবীহ'র নামায ২০ রাক'আত আদায় করা হতো। তিনি ইমামগণকে ২০ রাক'আত পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাবেঈ আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী আলী (রা.)-এর ব্যাপারে বলেন-

عن علىؓ قال: دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة قال: وكان علىؓ يوتربهم

হযরত আলী (রা.) রমাজান মাসে কারীগণকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন তাঁরা যেন লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ান। আর বিত্‌র পড়াতেন আলী (রা.) নিজেই। (আস সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২/৪৯৬/৪৬২০ (বর্ণনাটি হাসান, গ্রহণযোগ্য) ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক' নামক কিতাবে এটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ইমাম যাহাবী (রা.) বর্ণনাটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।)

অপর এক বর্ণনায় তাবেঈ আবুল হাসান (রহ.) বলেন-

أن عليا أمر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة۔

হযরত আলী (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে রমাজানে লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩, ৭৭৬৩)

এ ছাড়া হযরত আলী (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ শুতাইর ইবনে শাকাল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসান, আলী ইবনে বারীয়া প্রমুখ ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন ও পড়াতেন। (সুনানে বাইহাক্বী ২/৪৯৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩, কিয়ামুল লাইল, পৃ. ৯০।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তারাবীহ :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সার্বক্ষণিক সহচর প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল সম্পর্কে ইমাম মারওয়াযী (রহ.) বর্ণনা করেন-

ان(ابن مسعودؓ) يصلى عشرين ركعة ويوتر۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ২০ রাক'আত তারাবীহ এবং ৩ রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। (কিয়ামুল লাইল মারওয়াযী, পৃ. ৯০)

ইজমায়ে উম্মতের আলোকে তারাবীহ :

২০ রাক'আত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় থেকে যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তারাবীহ'র নামায জামা'আতবদ্ধভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ আরব-আজম তথা তামাম পৃথিবীতে মুসলমানদের নিকট এ বিষয়টা ব্যাপক ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কয়েকটি অনির্ভরযোগ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তে থাকে। বরং এতে সব মুহাজির ও আনসার সাহাবী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা-ঐকমত্য সংঘটিত হয়। যার বিপরীতে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্য সাহাবীদের কোনো ধরনের আপত্তি কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই।

১। এ ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম আতা বিন আবী রবাহ (রহ.) বলেন-

ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر۔

আমি লোকদেরকে (সাহাবী ও তাবেঈদেরকে) পেয়েছি, তাঁরা বিত্‌রসহ ২৩ রাক'আত পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩৯, ৭৬৮৮) বর্ণনাটি সহীহ এতে একজন বর্ণনাকারীও দুর্বল নেই।)

২। প্রখ্যাত ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন-

أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة۔

তারাবীহ'র নামায ২০ রাক'আতের ওপর সব সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) সংঘটিত হয়েছে। (মিরকাত শরহে মিশকাত ৩/৩৪৬)

৩। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ক্বাসতালানী (রহ.) লিখেছেন-

وقد عدوا ما وقع فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه كالاجماع۔

হযরত উমর (রা.)-এর যুগের অবস্থা প্রায় ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য পর্যায়ে গণ্য। (ইরশাদুস সারী শরহে বুখারী ৩/৪২৬)

৪। ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনীতে লিখেন-

أنه ما فعله عمرؓ وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فى عصرهم أحق وأولى بالاتباع۔

হযরত উমর (রা.) যা করেছেন এবং যে বিষয়ে সব সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের যুগে ইজমা-ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, তা

অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও অনুস্মরণীয়। (আল মুগনী ১/১৬৭)

৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) লিখেন-

فرأى كثيرمن العلماء أن ذلك (عشرين ركعة) هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكروه۔

অসংখ্য আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিই সুন্নাত। কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ২০ রাক'আত পড়িয়েছেন। আর কোনো একজনও তাতে আপত্তি করেননি। (মাজমু'আতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩)

মক্কা মুকাররমায় তারাবীহ :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবা এবং তাবেঈনের যুগ থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে ২০ রাক'আত তারাবীহর নিয়ম আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে আসছে। কোনো যুগেই এর কম বা বেশি পড়া হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় নেই।

এ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর নিজস্ব মতামত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)সহ অন্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে লিখেন-

واكثر أهل العلم ماروى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبى ﷺ عشرين ركعة وهو قول الثورى وابن المبارك والشافعى وقال الشافعى وهكذاأدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة۔

অধিকাংশ আলেম তারাবীহ'র রাক'আত প্রসঙ্গে ২০ রাক'আতের মতোই পোষণ করেন, যা হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর তা ইমাম সুফিয়ান সাওরী ইবনুল মুবারক ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, আমি পবিত্র মক্কাবাসীকে ২০ রাক'আত তারাবীহর নামায পড়তে পেয়েছি। (তিরমিযী শরীফ ৩/১৭০)

মদীনা মুনাওয়ারায় তারাবীহ :

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আব্দুল আযীয বিন রুফাই (রহ.) বর্ণনা করেন-

كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتوبثلاث۔

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) রমাজান মাসে লোকদের নিয়ে মদীনাতে ২০ রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিত্র পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩৯৩, ৭৭৬৬)

মোটকথা, পনের শত বছরের ইতিহাসে মদীনা শরীফে ২০ রাক'আতের কম তারাবীহর নামায কেউ পড়েননি।

শায়খ আতিয়্যাহ সালিম মাদানী (রহ.)-এর অভিমত :

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত আলেম, মদীনা শরীফের মাহকামার অন্যতম বিচারপতি, মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের স্বনামধন্য উস্তাদ, শায়খ আতিয়্যাহ মুহাম্মদ সালিম (রহ.) মসজিদে নববীতে দরস দান কালে আরবের বড় বড় শায়খ বিজ্ঞ আলেম ও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও ছাত্ররাও বসতেন। তিনি প্রতি শতাব্দীতে তারাবীহর অবস্থা তুলে ধরে বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরছি।

হিজরী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে তারাবীহ :

শায়খ আতিয়্যাহ সালিম (রহ.) লিখেন, দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুণ্যময় যুগে এবং তাঁর পরেও সাহাবায়ে কেরাম ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন। (এর কম কেউ পড়েছে ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই।) বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু অতি উৎসাহী লোক ৩৬ রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিত্র মিলে ৩৯ রাক'আত পর্যন্ত পড়েছেন। (আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ'ম, পৃ. ৪১)

হিজরী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারাবীহ :

এ শতাব্দীগুলোতে তারাবীহর অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেন–

عادت التراويح فى تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلامن ست وثلاثين۔

এই তিন শতাব্দীতে সবাই (৩৬) ছত্রিশের পরিবর্তে শুধু ২০ রাক'আত পড়তে থাকে। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪২)

হিজরী অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারাবীহ :

এ সম্পর্কে শায়খ লিখেন-

فكان يصلى التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد۔

এ যুগে প্রথম রাতে যথারীতি পূর্বের ন্যায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হতো। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭)

হিজরী চৌদ্দশ শতাব্দীতে তারাবীহ :

শায়খ লিখেন-

دخل القرن الرابع عشروالتراويح فى المسجد النبوى على ما هى عليه من قبل۔

চৌদ্দশ শতাব্দী শুরু হলো মসজিদে নববীতে তখনো পূর্বের মতোই তারাবীহ চলতে থাকে। (প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারাবীহর নামায ২০ রাক'আত পড়া ছিল সর্বযুগের চির মীমাংসিত একটি বিষয়, সে জন্য সব ভূখণ্ডেই এ নিয়ম চালু হয়। (প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫)

পরিশেষে, শায়খ আতিয়্যাহ সালিমের

অনুরোধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ তুলে ধরা হলো।

শায়খ আতিয়্যাহ সালিমের অনুরোধ :

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর পাঠকদের খেদমতে আমার জিজ্ঞাসা, মসজিদে নববী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাজার বছরেরও বেশি ইতিহাসে কখনো কি এতে তারাবীহর নামায কোনো দিন ৮ রাক'আত পড়া হয়েছে? অথবা ২০ রাক'আতের কম কি পড়া হয়েছে? বরং চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য দেয় যে, তারাবীহর নামায সর্বদা ২০ রাক'আত বা আরো বেশি পড়া হয়েছে।

আমি আরো জানতে চাই, কোনো মুহাজির বা আনসার সাহাবী বা যারা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন, তাদের কোনো একজনও কি বলেছেন যে, ৮ রাক'আতের বেশি তারাবীহ পড়া জায়েয হবে না? তাদের কোনো একজনও কি আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে ৮ রাক'আত তারাবীহর পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন? যখন এই দীর্ঘকালে একজন মাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও এমন পাওয়া যায় না, যিনি বলেছেন, এই দীর্ঘসময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদে কোনো দিন জামা'আতে ৮ রাক'আত পড়া হয়েছে। তার পরও যারা ৮ রাক'আত নিয়েই অটল আছেন এবং অন্যদেরকে সে দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদেরকে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের তথা ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিক আমলের বিরোধিতা করার চেয়ে অনুসরণ করাই অধিক শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে যিনি মসজিদে ইমামের পেছনে জামা'আতে তারাবীহ পড়বেন। (আত তারাবীহ আকসারা মিন আলফি আ'ম পৃ. ১০৮-১০৯)

সর্বোপরি, আমরা আমাদের দেশের আহলে হাদীস বন্ধুদের প্রতি এই অনুরোধ জানাই, কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। পূর্বসূরিদের নীতি মেনে চলুন।

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব :

এ রাতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

'নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতেই ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।'

এ সূরাতে যে সকল বিষয় জানা গেল তা হলো-

☆ এ রাত এমন এক রজনী, যাতে মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে।

☆ এ রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের চেয়েও এর মূল্য বেশি।

☆ এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে থাকে।

☆ এ রজনী শান্তির রজনী। আল্লাহর বান্দারা এ রাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি অর্জন করে থাকে।

☆ সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। এ আয়াতগুলোতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হলো। যত সময় তত বেশি কাজ করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না।

☆ গুনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা লাভ। এই রাতের ফজীলত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে নামায আদায় ও ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (বুখারী শরীফ ১২৬৬)

লাইলাতুল কদর কখন?

পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোনটি। তবে কুরআনের ভাষ্য হলো, লাইলাতুল কদর রমাজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমাজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে এবং এ রজনী রমাজানের শেষ দশকে হবে বলে হাদীসে এসেছে এবং তা রমাজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদীসে বর্ণিত।

'তোমরা রমাজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।' (বুখারী শরীফ ১৮৭৪)

এবং রমাজানের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর থাকার সম্ভাবনা অধিকতর। যেমন হাদীসে এসেছে

'যে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করতে চায় সে যেন শেষ সাত দিনে অন্বেষণ করে।' (বুখারী শরীফ ১৮৭৩)

অধিকতর সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রথম

হলো, রমাজান মাসের সাতাশ তারিখ। দ্বিতীয় হলো, পঁচিশ তারিখ। তৃতীয় হলো, ঊনত্রিশ তারিখ। চতুর্থ হলো, একুশ তারিখ। পঞ্চম হলো, তেইশ তারিখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতকে গোপন রেখেছেন আমাদের ওপর রহম করে। তিনি দেখতে চান এর বরকত ও ফজীলত লাভের জন্য কে কত প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

লাইলাতুল কদরে আমাদের করণীয় হলো বেশি করে দু'আ করা। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লাইলাতুল কদরে আমি কী দু'আ করতে পারি? তিনি বললেন, এই দু'আ করে-

اَللّٰهُم إِنَّكَ عَفُوٌّ تحِبُّ العَفوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।' (ইবনে মাজাহ ১৯৮২)

হাদীস মানার নামে অসংখ্য হাদীস অস্বীকারকারী , হযরত সহাবায়ে কেরামকে বিদআতী বিশ্বাসকারী বর্তমান যমানায় সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনাকারী লা-মাযহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচনে **শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক** কর্তৃক লিখিত প্রামাণিক তিনটি বাংলা কিতাব সংগ্রহ করুন।

১. কুরআন সুন্নাহের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
২. তুহফাতুল হাদীস
৩. হাদীসে রাসূল সা.

যোগাযোগ: মুফতী শফীক সালমান কাশিয়ানী
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট,
সাতমসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৭৪৭৯৯৯৯৭৩, ০১৬৮৮৭৪৬০৫৯

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৬

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

নোটের শরয়ী অবস্থান ও মর্যাদাবিষয়ক চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি :

নোট স্বকীয়ভাবে ছামানে উরফী (Customary Price) এবং বিধানের ক্ষেত্রে পয়সা Pices এর মতো অর্থাৎ নোট ঋণের সার্টিফিকেট, পণ্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিকল্প নয় বরং স্বতন্ত্র ছামান এবং বিধানের ক্ষেত্রে পয়সার মতো।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। তাই এই মতটা অন্যান্য মতের ওপর অধিক গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে পেশ করা হলো।

১। শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সালমান (দারুল ইফতা রিয়াদ) তিনি বলেন,

هذه النظرية ترى ان الاوراق النقدية كالفلوس فى طرو الثمنية عليها فما ثبت للفلوس من احكام الربا والزكاة والسلم تثبت للاوراق النقدية مثلها وقد قال بهذه النظرية مجموعة كبيرة من افاضل العلماء يعتبر القائل بها فى الجملة وسطا بين القائلين بالنظرية السندية والقائلين بالنظرية العرضية ولاشك انه اقرب الاقوال الى الاصابة فى نظرنا۔ (النقد الورقى ٨٣)

অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম হলো যে নোট ছামান হওয়ার মধ্যে পয়সার মতো, সুতরাং সুদ, যাকাত, ছালাম ইত্যাদির যেসব বিধান পয়সার ওপর আরোপিত হয় তা নোটের ওপরও আরোপ করা যাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ওলামায়ে কেরামের বড় জমা'আতের এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা পূর্বে বর্ণিত দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে বিচারক। অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গিটা মধ্যম পন্থানির্ভর এবং নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দৃষ্টিতে হক এবং সত্য।

২। শায়খ আহমদ খতীব লেখেন–

فتبين بجميع ذلك ان النوت كالفلوس النحاسية فى جميع احكامها ظاهرا وباطنا اقناع الفلوس بالحاق النوت بالفلوس (ص٤٨)

অর্থাৎ সমস্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে নোট সার্বিকভাবে সব বিধানে তাম্র দ্বারা তৈরি পয়সার মতো।

৩। শায়খ আবদুল্লাহ বিন বুচ্ছাম বলেন :

لانها ليست ذهبا ولا فضة وانما هى اثمان تتغير كما تتغير القروش بالكساد والرواج وتقرير الحكومات۔۔۔ فان كان الورق بالقروش اشبه وبه اولى فالاحسن ان تلحق به وان تعطى حكمه وحكم القروش معروف (الورق النقدى ٨١)

অর্থাৎ যেহেতু নোট স্বর্ণ-রৌপ্য নয়, সেটা হলো ছামান Price। তাতে প্রচলন এবং সরকারের পরিবর্তনে তার মধ্যেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন পিয়াস্টার Piaster (মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত মুদ্রার একক) এ হয়। যেহেতু নোটের সাথে পিয়াস্টারের সাদৃশ্যতা অত্যাধিক সেহেতু উত্তম হলো সব বিধিবিধানেও তার সাথে সংগতি রাখা।

৪। সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সিদ্ধান্ত :

ان الورق النقدى يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية فى الذهب والفضة وغيرها من الاثمان وانه اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدار بمعنى ان الورق النقدى السعودى وان الورق النقدى الامريكى جنس وهكذا كله عملة ورقية جنس مستقل بذاته (ابحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية طبع اول ١٤٠٩، ١/٥٧)

অর্থাৎ নোট জাতিগতভাবে মুদ্রা। যেমনটা স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি এবং নোটের প্রকার ইস্যুকারীর ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে যথা সৌদি নোট রিয়াল এবং আমেরিকান নোট ডলার ভিন্ন জাতের হয়। তদ্রূপ সর্ব প্রকারের নোট ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়ে থাকে।

৫। জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী লেখেন –

فاتضح بما ذكرنا ان النقود الورقية لم تبق الآن سندات للديون فى تخريجها الفقهى وانما صارت اثمانا رمزية يعبر عنها الفقها بكلمة الفلوس النافقة فان الفلوس النافقة تكون قيمتها الاسمية اضعاف قيمتها الذاتية فكذا لك الاوراق النقدية تكون قيمتها الاسمية اضعاف قيمتها الذاتية وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس دون ايما فرق بينها وبين الفلوس النافقة ۔ (احكام الاوراق النقدية للعثمانى ١٥)

অর্থাৎ আমাদের আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ব্যাংকনোট বর্তমানে ঋণের সার্টিফিকেট নয় বরং এখন প্রতীকী মুদ্রা Token money হয়ে গেছে। যাকে ফুকাহায়ে কেরামের ভাষায় ফুলুসে নাফেকা অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রা বলা হয়। কেননা প্রচলিত মুদ্রার বাহ্যিক মূল্য তার নিজস্ব মূল্যের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি হয়। কাগজের মুদ্রারও একই অবস্থা। তার নিজস্ব মূল্যের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি এবং ব্যাংকনোটের মাধ্যমে মানুষের মাঝে দৈনন্দিন কার্যক্রম চলমান। প্রচলনের দিক দিয়ে ব্যাংকনোট এবং পয়সার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই।

৬। ড. মুহাম্মদ সোলাইমান আল আশকার এ সম্পর্কে লেখেন–

القول الثالث انها عملة نقدية قائمة بذاتها تعامل معاملة الذهب والفضة الا انها شئ آخر ليست هى الذهب وليست هى الفضة وليست هى قائمة مقام الذهب ولا الفضة بل هى اجناس اخرى بحسب الدول المصدرة لها فالدنانير الكويتية جنس والدنانير العراقية جنس ثان والدولارات الامريكية جنس ثالث وهكذا ودليل هذا القول دليل واحد وهو القياس على الذهب الفضة بجامع الثمنية وهذا القول هو السائد الآن فى الاوساط الاسلامية الملتزمة بالشريعة--- وقد درج عليه غالبية المسلمين الملتزمين فى التعامل--- وصدرت الفتاوى من كثير من المفتيين بهذا القول وصدرت قرارات من بعض المجامع الفقهية بموجبه (مجلة مجمع الفقه الاسلامى الدورة الخامسة العدد الخامس الجزء الثالث ١٤٠٩هـ ص ١٦٨٦)

অর্থাৎ ব্যাংকনোট বিষয়ে তৃতীয় মত হলো যে, ব্যাংকনোট স্বয়ং স্বতন্ত্র এক প্রকারের মুদ্রা, যার সাথে স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো আচরণ হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংকনোট ভিন্ন একটা জিনিস, যা স্বর্ণ-রৌপ্যও নয় আবার ওইগুলোর স্থলাভিষিক্তও নয়। বরং তা ইস্যুকারী দেশ হিসেবে ভিন্ন একটা জাত বা প্রকার। যথা কুয়েতি দিনার একজাত, ইরাকি দিনার ভিন্ন আরেকটি জাত। তেমনিভাবে আমেরিকান ডলার আরো একটি জাত। এভাবে সব দেশের মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। উক্ত মতের দলিল একটাই। তা হলো ব্যাংকনোটকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর ছামানিয়্যাত তথা Price হওয়ার ইল্লতের ভিত্তিতে তুলনা করা। বর্তমান বিশ্বের যেসব দেশে শরীয়া বিধিবিধানের অনুসরণ করা হয় সেখানে উক্ত মতকে যথার্থ মনে করা হয় এবং অধিকাংশ মুসলমান ওই হিসেবে তাদের লেনদেন পরিচালনা করে। অনেক মুফতী সাহেবানরা এ হিসেবে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন এবং অনেক দেশের ফিকহী একাডেমি ওই হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উপরোক্ত মতামতের দলিলসমূহ :

১। ব্যাংকনোট Legal tender হয়ে গেছে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকনোট গ্রহণ করার ওপর জনসাধারণকে এভাবে বাধ্য করা হয় যে, যেমনিভাবে পারিভাষিক ছামান তথা Customary price গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। অথচ অন্যান্য আর্থিক ডকুমেন্টগুলো গ্রহণ করতে ওই রূপ বাধ্য করা হয় না। যথা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ঋণ দেয় অথবা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে কোনো পণ্য বিক্রি করে তখন ঋণগ্রহীতা এবং ক্রেতা তাকে ব্যাংকনোট প্রদান করে থাকে। তখন তা গ্রহণ না করার অবকাশ থাকে না। কিন্তু সে যদি নোটের পরিবর্তে চেক প্রদান করে তখন বিক্রেতা এবং ঋণদাতা তা গ্রহণ না করার আইনত অধিকার রাখে। উল্লেখ্য, নোট হলো Unlimited legal tender.

২। ঋণের সার্টিফিকেট যে কেউ ইস্যু করতে পারে। যথা ঋণগ্রহীতা ঋণ দাতার জন্য যেকোনো প্রকারের ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু নোট ইস্যু করার এখতিয়ার আইনত যে কেউ রাখে না।

৩। যদি লক্ষ করা হয় আমরা দেখতে পাই যে, সব সমাজে ও পরিভাষায় নোটকে মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা হয়, যা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, নোট ঋণের সার্টিফিকেটও নয় আবার পণ্যও নয়। এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিকল্পও স্থলাভিষিক্তও নয়।

৪। ব্যাংকনোট দ্বারা সারা জগতে লেনদেন প্রচলিত। সর্বসাধারণ নির্দ্বিধায় লেনদেন করে থাকে নোটের মাধ্যমে। কেউ এটা চিন্তাও করে না যে, এই নোটের বিপরীতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের অস্তিত্ব আছে কি না? এমতাবস্থায় স্বর্ণ-রৌপ্যের ডকুমেন্ট, পণ্য অথবা স্বর্ণ-রৌপ্যের বিকল্প কিভাবে বলা যেতে পারে?

৫। স্বর্ণ-রৌপ্যের উন্নতি Evolution এর যে ধাপগুলো অতিবাহিত হয়েছে সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে ব্যাংকনোটের বিপরীতে স্বর্ণ-রৌপ্য মোটেও নেই। এমতাবস্থায় ব্যাংকনোট স্বর্ণ-রৌপ্যের সার্টিফিকেট বলা যাবে? অথবা উভয়ের বিকল্প হবে কিভাবে?

৬। নোটকে যদি ঋণের সার্টিফিকেট বা পণ্য বলা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বহুরৈখিক সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা সবিস্তারে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুদের পথ সুগম হয় ও এর দ্বারা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (سد الذرائع) অবৈধ পথ অবলম্বনসূত্র বন্ধ করা। এতেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেন না নোটকে যদি পণ্য বলা হয় এবং এর মধ্যে রিবাল ফজল তথা বিনিময়সংক্রান্ত সুদকে বৈধতা দেওয়া হয় তখন মানুষ বেচা-বিক্রির পদ্ধতিতে এর কার্যক্রম শুরু করে দেবে। তাতে রিবাল ফজল তথা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের ছড়াছড়ি হবে সমাজে। কেননা আমাদের কাছে তো স্বর্ণ-রৌপ্য নেই, নোটই সর্বেসর্বা।

৭। নোটকে যদি ঋণের সার্টিফিকেট বা পণ্য বলা হয় তখন সর্বসাধারণ লেনদেন ও দৈনন্দিন কার্যাদি আঞ্জাম দিতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে। যা পূর্বে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়তের স্বীকৃত অন্যতম মূলনীতি হলো সর্বসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনযাপনে সর্বপ্রকারের সমস্যা থেকে মুক্তি প্রদান করা। الحرج مدفوع فى الشرع

পক্ষান্তরে নোটকে স্বতন্ত্রভাবে ছামান Price বলাতে ওই ধরনের কোনো প্রকারের সমস্যার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

৮। পূর্বে মুদ্রার Money যে সংজ্ঞা পেশ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকনোটের ওপর প্রযোজ্য। সুতরাং ব্যাংকনোটকে মুদ্রার স্বীকৃতি না দেওয়া

অন্যায় বৈ কি?

৯। পূর্বে মুদ্রার Money যে কার্যকরিতা ও ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে ব্যাংকনোটের মধ্যে ওই সব কিছু পরিপূর্ণতার সহিত পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও ব্যাংকনোটকে কেন মুদ্রা বলা হবে না?

নোটের শরয়ী অবস্থান ও মর্যাদাসংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য মত :

উপর্যুক্ত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, নোটের শরয়ী অবস্থান ও মর্যাদাবিষয়ক গ্রহণযোগ্য মত হলো, নোট স্বতন্ত্র ছামান। তাই এর ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো সব বিধিবিধান আরোপিত হবে। তবে এতটুকু পার্থক্য থাকে যে, স্বর্ণ-রৌপ্য হলো ছামানে খিলকী বা প্রকৃতিগত বিনিময় মাধ্যম। এবং নোট হলো পারিভাষিক বিনিময় মাধ্যম। তাই ব্যাংকনোট ঋণের সার্টিফিকেট Debt certificate ও নয় আবার পণ্য Goods ও নয়। তদ্রূপ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিকল্প Substituteও নয়।

উপর্যুক্ত মতের গ্রহণযোগ্যতার কারণসমূহ :

১। ব্যাংকনোটের ওপর মুদ্রার উল্লিখিত সংজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য হয়।

২। মুদ্রার শরয়ী এবং অর্থনৈতিক যেসব কার্যকরিতা এবং ভূমিকা Functions রয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে ব্যাংকনোট আদায় করে থাকে।

৩। নোটকে স্বতন্ত্রভাবে ছামান স্বীকৃতি দেওয়ার দ্বারা যাকাত, সালাম, মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি কার্যক্রমে ভীষণ সহজতা ও সুবিধা সৃষ্টি হয়।

৪। নোটকে মুদ্রা বললে সুদের দরজা বন্ধ হয় এবং ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি سد الذرائع তথা অবৈধ পথ অবলম্বনের সূত্র বন্ধ করার ওপর আমল হয়।

৫। নোটের বিপরীতে কোনো প্রকারের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অস্তিত্ব নেই।

৬। বিশ্বের সর্বত্র ব্যাংকনোটের ওপর মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

৭। ব্যাংকনোট দ্বারা লেনদেন করার সময় কারো মনের মধ্যেও স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধারণাও জন্মে না।

৮। ব্যাংকনোটকে আইনগতভাবে মুদ্রার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাই তাকে Legal tender বলা হয়।

৯। নোট ইস্যু করার অধিকার যে কারো থাকে না। বরং শুধুমাত্র যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক State bank তা ইস্যু করার অধিকার রাখে।

উপরোক্ত যৌক্তিক কারণগুলোকে সামনে রেখে জমহুর উলামায়ে কেরাম এই মতকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। এবং শরীয়া বিধিবিধান প্রয়োগেও এই মতের আলোকে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম নোটকে ঋণের সনদ বা Debt certificate বলেছেন তাদের মতও যথার্থ। তবে শর্ত হলো ব্যাংকনোটের বিপরীতে স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকতে হবে। তাই যে যুগে ব্যাংকনোটের বিপরীতে স্বর্ণ বা রৌপ্য ছিল তখন তাদের মত অনুযায়ী কেউ যদি ব্যাংকনোটকে ঋণের সনদ বলে তাহলে তা ঠিক। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু নোটের বিপরীতে কোনো প্রকারের স্বর্ণ বা রৌপ্যের অস্তিত্ব নেই তাই নোটকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের সনদ/ রসিদ বলার অবকাশ থাকে না।

ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত নীতি হলো যুগের পরিবর্তনের কারণে মনসূস নয়, এমন শরয়ী বিধিবিধানের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। যার দৃষ্টান্ত ইসলামী শরীয়তে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। তাই বলা যেতে পারে যে, নোটের বিষয়ে যেহেতু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নস Provision নেই। অর্থাৎ গাইরে মনসূস আলাইহি তথা রায় দেওয়া হয়নি, এমন বিষয় তাই এর বিধানের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে যুগের পরিবর্তনে। যখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণ বা রৌপ্য ছিল তখন যদিও নোটকে Debt Certificate বলা হতো বর্তমানে যেহেতু নোটের বিপরীতে কোনো প্রকারের স্বর্ণ বা রৌপ্যের অস্তিত্ব নেই সুতরাং ব্যাংকনোটকে Debt Certificate আর বলা যাবে না। বরং তা স্বতন্ত্র ছামানে পরিণত হয়েছে।

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নোটের মাহিত্ব ও শরয়ী মর্যাদা বিষয়ে ইসলামী ফিকহবিদদের মতবিরোধের ভিত্তি হলো সময়ের পরিবর্তনে রায়ের পরিবর্তন।

জ্ঞাতব্য, নোটসংক্রান্ত উল্লিখিত চার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে Debt Certificate দৃষ্টিভঙ্গি এবং Goods দৃষ্টিভঙ্গি উভয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তবে অপর দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা অংশে উভয়টা সম্পূর্ণ রূপে এক। তা হলো নোট এটা Price ও নয় Debt Certificate ও নয় আবার Goodsও নয়। কিন্তু উভয়টার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নোট স্বয়ং স্বতন্ত্র ছামান নয়। বরং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিকল্প, স্থলাভিষিক্ত। তাই তাকে ছামান বলা হয়। সুতরাং নোটের বিধান ও স্বর্ণ-রৌপ্যেরই হবে। এমনকি ওই মতানুসারে নোটকে নোটের সাথে বিনিময় বাইয়ে সরফ হবে। পক্ষান্তরে চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নোট স্বতন্ত্র ছামান। কোনো কিছুরই বিকল্প বা স্থলাভিষিক্ত নয়। তবে ছামান হওয়ার কারণে বিধিবিধান স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো হবে। কিন্তু উভয় প্রকারের ছামানের মধ্যে পার্থক্য থাকবে প্রকৃতিগত ও পারিভাষিক দিক দিয়ে। নোট পারিভাষিক বিনিময় মাধ্যম আর স্বর্ণ-রৌপ্য প্রকৃতিগত বিনিময় মাধ্যম। তাই নোট পয়সার মতো হবে। ফলে নোটকে নোটের মাধ্যমে হাত বদলে বাইয়ে সরফ হবে না। অথচ স্বর্ণকে স্বর্ণের মাধ্যমে হাতবদল এবং রৌপ্যের মাধ্যমে হাতবদলের ক্ষেত্রে বাইয়ে সরফ হবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

বিত্‌র নামাযের সঠিক পদ্ধতি

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

বিত্‌র নামাযের সঠিক পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামায। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর অতি গুরুত্বপূর্ণ নামায বিত্‌র। বর্তমানে নামাযের বিভিন্ন মাসাইলে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত চলছে। চলছে বিত্‌র নামাযে দ্বিধাবিভক্ত করার রকমারি অপকৌশল। বিব্রত হচ্ছে সাধারণ মুসলমান বিত্‌র নামাযের প্রতিটি পর্বে, অধ্যায়ে। এমন পরিস্থিতিতে বিত্‌র নামাযের যাবতীয় দিক হাদীসের আলোকে পর্যালোচনার দাবি রাখে। প্রয়োজন এসেছে সাধারণ মুসলমানদের খেদমতে এর সঠিক পদ্ধতি উপস্থাপন করা। এ পরিসরে আমরা আংশিক আলোচনার প্রয়াস পাব।

বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়াই ওয়াজিব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়েছেন। সাহাবা, তাবেয়ীগণও এভাবেই বিত্‌র আদায় করেছেন। বুখারী তিরমিযীসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কীয় অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য প্রাক্তন ইমামগণের ইজমা ও ঐকমত্য। কয়েকটি সহীহ হাদীস নিম্নরূপ :

১. সহীহ বুখারীতে আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.)-কে রমাজানে রাসূল (সা.)-এর (শেষ রাতের) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে আয়েশা (রা.) বলেন,

ماكان رسول الله ﷺ يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثا۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) (শেষ রাতে) রমাজানে বা রমাজান ছাড়া কখনো এগার রাক'আতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন, যার মান ও দীর্ঘতা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতঃপর চার রাক'আত পড়তেন, যার মান ও দীর্ঘতা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়তেন। (বুখারী ১/২৬৯ হা. ২০১৩)

উপরোল্লিখিত বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

ক. হাদীসের প্রথম অংশে চার রাক'আত চার রাক'আত করে আট রাক'আত নামাযের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ওই আট রাক'আত এমন ধরনের নামায ছিল, যা রমাজান মাসে এবং রমাজান মাস ছাড়াও পড়া যায়। আর তা হলো তাহাজ্জুদ বা শেষ রাতের নামায। বিষয়টা উল্লিখিত হাদীসেই উদ্ধৃত আছে।

খ. হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) আট রাক'আত পড়ার পর তিন রাক'আত নামায পড়তেন। ওই তিন রাক'আতই হলো বিত্‌র নামায।

গ. উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ বুখারীর। হাদীস সহীহ এতে কারো নাক গলানোর সুযোগ নেই। এছাড়া একটি চিহ্নিত মহল কথায় কথায় আজ বুখারী বুখারী বলে থাকে। তাই তাদের জন্য এই হাদীসের ব্যতিক্রম করা বা তিন রাক'আতের ব্যতিক্রম কোনো পদ্ধতিতে বিত্‌র পড়া সমীচীন হবে না।

২. আব্দুল আযীয বিন জুরাইজ বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি– بأى شئ كان يوتر رسول الله ﷺ ؟ قالت: كان يقرأ فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا ايها الكافرون، وفى الثالثة بقل هو الله احد والمعوذتين۔

মহানবী (সা.) কোন সূরার মাধ্যমে বিত্‌র নামায আদায় করতেন? উত্তরে আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতে সূরায়ে আ'লা পড়তেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে কাফিরুন পড়তেন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরায়ে ইখলাস পড়তেন, কোনো কোনো সময় সূরায়ে নাস বা ফালাক পড়তেন। (তিরমিযী ১/১০৬ হা. ৪৬৩)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য উত্তম। ইমাম হাকেম ও যাহাবী (রহ.) হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলেছেন। (মুসতাদরাক ১/৩০৫ হা. ১১৪৪)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

كان رسول الله ﷺ يصلى من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث، ويصلى ركعتين قبل صلاة الفجر۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ রাতে আট রাক'আত নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। আর ফজরের (ফরযের) পূর্বক্ষণে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। (নাসাঈ ১/২৪৯ হা. ১৭০৬)

ইমাম আইনী বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (নুখাবুল আফকার ৫/৭২,৭৩)

৪. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث

রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন রাক'আত বিত্‌র নামায পড়তেন। (মুস্তাদরাক ১/৩০৪ হা. ১১৪০)

হাকেম ও যাহাবী বলেছেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "রাতের বিত্‌র তিন রাক'আত, যেমন দিনের বিত্‌র (বেজোড় নামায) মাগরিবের নামায তিন রাক'আত।"

ইজমা, উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর সাথে সাথে তিন রাক'আত বিত্‌র নামায বিষয়ে মুসলিম মিল্লাতের ইজমা ও ঐকমত্য চলে এসেছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী উমর ইবনে আব্দুল আযীয, হাসান বসরী ও ইমাম কারখী প্রমুখ ইমামগণ এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত সহীহ বর্ণনায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিত্‌র নামায তিন রাক'আত। আর সাথে সাথে রয়েছে মুসলিম মিল্লাতের ইজমা। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ না করে কোনো মনগড়া মতবাদের আলোকে নতুন কিছু রচনা করা সমীচীন হবে কি? চিন্তা করার সময় এসেছে।

এক রাক'আত কোনো নামায নেই

অতিবাহিত অধ্যায়ে বুখারী শরীফসহ নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতিতে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি। যাতে প্রমাণ হয় মহানবী (সা.) বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়েছেন। তাই আমাদেরও তিন রাক'আত পড়াই সমীচীন।

এছাড়া এ বিষয়ে এমন কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়, যাতে এক রাক'আত বিত্‌র পড়া থেকে বারণ করা হয়েছে।

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত–

إن رسول الله ﷺ "نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রাক'আত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন। (আত-তামহীদ ৫/২৫৭) হাদীসটি হাসান, গ্রহণযোগ্য উত্তম। দেখুন উমদাতুল কারী ৫/২১৫)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে খবর পৌঁছে সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বিত্‌র নামায শুধু এক রাক'আত পড়েন। তা জেনে ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন مـأجـز أت ركعة قـــــط "এক রাক'আত বিত্‌র নামায কখনো জায়েয বলি না।" (দুররে মানসূর ২/১২১, আল মুজামুল কাবির হা. ৯/৩২৬ হা. ৯৪২২, ইমাম হায়সামী বলেন, হাদীসটি হাসান, গ্রহণযোগ্য উত্তম, মাজমা : ২/২৪২)

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.)-এর দর্শন

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) লেখেন, বিত্‌র নামায কারো মতে ফরয, আর কারো মতে সুন্নাত। যদি ফরয গণ্য করা হয় তাহলে আমরা কোনো ফরয নামায তিনটি পদ্ধতির ব্যতিক্রম পাই না। কিছু আছে দুই রাক'আতবিশিষ্ট, কিছু তিন রাক'আতবিশিষ্ট আর কিছু হলো চার রাক'আতবিশিষ্ট। তবে বিত্‌র নামায সর্বসম্মতিক্রমে দুই বা চার রাক'আত হবে না। তাই তিন রাক'আতই হবে। আর যদি বিত্‌র নামায সুন্নাত হয় তাহলে কোনো সুন্নাত নামাযই ফরযের ব্যতিক্রম বা এক রাক'আত কোনো নামায আমরা খুঁজে পাইনি। (ত্বাহাবী ১/২০৫)

তিন রাক'আতের বেশি বিত্‌র পড়া সঠিক নয়

ইতিমধ্যেই আমরা বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি, যার সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়তেন। এ অবস্থায় কোনো মুসলমানের জন্য কত রাক'আত পড়বেন এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করার অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঠিক অনুসরণ যারা করতে চায় তাদের জন্য তিন রাক'আতের অতিরিক্ত পড়া সঠিক নয়। কিন্তু কেউ কেউ কয়েকটি সহীহ হাদীসের ভুল মর্ম বুঝে বিত্‌র নামায এক রাক'আত বা তিন রাক'আতের বেশি ইত্যাদি আজগুবি অপব্যাখ্যা ছড়াচ্ছে। তাই তাদের সংশয় নিহিত কয়েকটি বর্ণনা ও সঠিক সমাধান নিম্নে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

১. আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত,

ان رسـول الـلّـه ﷺ قال: الوتر حق فمن شـاء فـليـوتـر بـخـمـس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিত্‌র নামায আল্লাহর অধিকার। যার ইচ্ছা পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়বে, যার ইচ্ছা তিন রাক'আত বিত্‌র পড়বে, আর যার ইচ্ছা এক রাক'আত বিত্‌র পড়বে। (আবু দাউদ ১/২০১, হা. ১৪২২, সহীহ)

২. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত

كـان رسـول الـلّـه ﷺ يصلى عن الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة۔

নবীজি (সা.) রাতে দুই রাক'আত দুই রাক'আত নামায পড়তেন। দুই রাক'আতের সাথে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র নামাযে পরিণত করতেন। (বুখারী ১/১৩৫ হা. ৯৯৫)

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

كـان رسـول الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে তের রাক'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে বিত্‌র পড়তেন পাঁচ রাক'আত। (মুসলিম ১/২৫৪ হা. ৭৩৭)

৪. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত–

كـان رسـول الـلّـه ﷺ يوتـر بسبع او بخمس

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাত রাক'আত অথবা পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। (ইবনে মাজাহ ৮৩ হা. ১১৯২)

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–

أن رسول الله ﷺ قال: لاتوتروا بثلاث اوتـروا بـخـمـس او بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তিন রাক'আত বিত্‌র পড়ো না। পাঁচ

রাক'আত অথবা সাত রাক'আত বিত্‌র পড়ো। মাগরিব নামাযের সাদৃশ্য করো না। (দারা কুতনী ২/১৮ হা. ১৬৩৫)

সমাধান

উপরের বর্ণনাগুলোতে কয়েকটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। প্রথম কথা হলো এক রাক'আত বিত্‌র নামায কিভাবে গণ্য হয়?

আসলে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসেই পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো রাসূল (সা.) রাতে দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে নফল নামায পড়তেন। শেষ দুই রাক'আতের সঙ্গে আরো এক রাক'আত যোগ করে ওই দুই রাক'আতকে বিত্‌র বা বেজোড় নামাযে পরিণত করতেন। (বুখারী ১/১৩৫ হা. ৯৯৫)

বিষয়টা বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসের পূর্বের হাদীসটিতে আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ماصليت۔

রাতের নফল নামায দুই রাক'আত দুই রাক'আত। তুমি যদি নামায শেষ করে চলে যেতে চাও তখন শেষ দুই রাক'আতের সাথে এক রাক'আত যোগ করে পড়বে। তাহলে পূর্বে আদায়কৃত নামায বিত্‌র নামাযে পরিণত হবে। (বুখারী ১/১৩৫ হা. ৯৯৩, দেখুন উমদাতুল কারী ৫/২১৯, তামহীদ ৫/২৫৬)

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) কতই না সুন্দর বলেছেন, বিত্‌র নামায এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাক'আত ইত্যাদি যেকোনোভাবে পড়ার অধিকার ইসলামের প্রথম যুগের কথা। যখন বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আর যখন বিত্‌র তিন রাক'আত পড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো তখন থেকে রাসূল (সা.) নিয়মিত তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তেন, যা বুখারীসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে। (দেখুন বুখারী ১/২৬৯ হা. ২০১৩) এর পর থেকে এক রাক'আত, পাঁচ রাক'আত ইত্যাদি বিত্‌র পড়ার কোনো অধিকার বহাল থাকেনি। (উমদাতুল কারী ৫/২১৫)

শিব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে কখনো ১৭ রাক'আত নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাযের প্রারম্ভিকা হিসেবে প্রথমে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর ৮ রাক'আত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। এরপর তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। এই হলো ১৩ রাক'আত। অতঃপর কখনো বসে বসে ২ রাক'আত নামায পড়তেন। যেভাবে মাগরিবের পর দুই রাক'আত পড়া হয়। সর্বশেষে আযানের পর পর দুই রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়তেন। যারা সব একত্রে যোগ করে বলেছেন, তারা বলেছেন ১৭ রাক'আত। আর যারা ফজরের ২ রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত হিসাব করেছেন তারা বলেছেন ১৫ রাক'আত। আর যারা শুরুর দুই রাক'আত অথবা বিত্‌রের পরের দুই রাক'আত হিসাব করেননি তারা বলেছেন ১৩ রাক'আত। এভাবে যারা তাহাজ্জুদের মূল ৮ রাক'আত ও তিন রাক'আত বিত্‌র গণ্য করেছেন তাদের হিসাবে রাতের নামায হবে ১১ রাক'আত। আর যারা পাঁচ, সাত বা নয় রাক'আত বলেছেন এর কারণ হলো রাসূল (সা.) বয়স ও দুর্বলতার কারণে আট রাক'আত তাহাজ্জুদের পরিবর্তে আরো কমিয়ে পড়েছেন তখন তিন রাক'আত বিত্‌র মিলিয়ে পাঁচ, সাত অথবা নয় রাক'আতে পরিণত হয়েছে। (ফতহুল মুলহিম ৫/৫)

সর্বশেষে থেকে যায় আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি।

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন রাক'আত বিত্‌র পড়ো না। পাঁচ, সাত রাক'আত বিত্‌র পড়ো। মাগরিব নামাযের মতো করো না।" (দারা কুতনী ২/১৮ হা. ১৬৩৫)

এই হাদীসে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এক. এতে তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ বুখারী শরীফের হাদীস হলো রাসূল (সা.) বিত্‌র নামায তিন রাক'আত পড়েছেন। (বুখারী হা. ১/২৬৯ হা. ২০১৩)

তাহলে তিন রাক'আত বিত্‌র না পড়ার কী অর্থ হবে? এমন কোনো অর্থ অবশ্যই বলতে হবে যাতে বুখারীর হাদীসের সাথে বিরোধ না হয়।

তাই হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদীসটি হয়তো রহিত বলে গণ্য হবে অথবা হাদীসটিতে শুধু তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন। বরং এর পূর্বে দুই দুই রাক'আত করে কিছু তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেভাবে রাসূল (সা.) বিত্‌রের পূর্বে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (বুখারী ১/১৩৫ হা. ৯৯৩-৯৯৫, মুসলিম ১/২৫৪ হা. ৭৩৬)

দুই. হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে বিত্‌র নামায তোমরা মাগরিবের মতো করো না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)সহ অন্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ থেকে বিত্‌র নামায মাগরিবের নামাযের মতো বলে বর্ণিত আছে। (তাহাবী ১/২০৬)

তাহলে দু'ধরনের বর্ণনায় বিরোধ না হয় এমন কোনো ব্যাখ্যা অবশ্যই পেশ করতে হবে। তাই হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিত্‌র নামায মাগরিবের নামাযের মতো পড়ো না এর অর্থ হলো মাগরিবের পূর্বে যেভাবে সুন্নাত নামায পড়া হয় না এভাবে বিত্‌র নামাযের পূর্বে সুন্নাত নফল না পড়ে শুধু তিন রাক'আত বিত্‌র নামায পড়ো না। বরং এর পূর্বে দুই দুই রাক'আত করে কিছু তাহাজ্জুদ পড়ে নাও।

যারা এই হাদীস দ্বারা বিত্‌র নামাযে প্রথম বৈঠক হবে না বলে প্রমাণ পেশ

করে থাকে আশা করি উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে তাদের ভুল ব্যাখ্যাটিও স্পষ্ট হয়েছে। তাই ইমাম নিমভী (রহ.) লেখেন, বিত্র নামায মাগরিবের মতো করো না। এর অর্থ প্রথম বৈঠক করো না বলা ভুল। বরং এর অর্থ হলো বিত্রের পূর্বে কিছু সুন্নাত-নফল পড়ে মাগরিবের ব্যতিক্রম করা চাই। (আসারুস সুনান পৃ. ২০০)

বিত্র নামাযেও প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী যাবতীয় নামাযেই দুই রাক'আত পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হয়। দুই রাক'আতের অতিরিক্ত নামায হলে দুই রাক'আত পর প্রথম বৈঠক এবং নামায শেষে দ্বিতীয় বৈঠক করা জরুরি। শরীয়তের বিধান মতে প্রথম বৈঠকটি ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় বৈঠকটি ফরয হিসেবে গণ্য। তাই মাগরিবের দুই রাক'আত পর ১টি বৈঠক ওয়াজিব এবং তিন রাক'আত পর শেষ বৈঠকটি ফরয। একইভাবে বিত্রের দুই রাক'আত পর বসা ওয়াজিব। একাধিক হাদীসে বিত্র নামাযকে মাগরিব নামাযের সাদৃশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এতেও মাগরিব নামাযের মতো দুই রাক'আত পর বসা জরুরি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب

রাতের বিত্র (বেজোড় নামায) তিন রাক'আত যেভাবে দিনের বিত্র (বেজোড় নামায) তিন রাক'আত। (সুনানে দারা কুতনী ২/১৮ হা. ১৬৩৭, সনদ হাসান গ্রহণযোগ্য উত্তম হাদীস)

হযরত আয়েশা (রা.) নবীজি (সা.)-এর নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

كان رسول الله ﷺ يقول فى كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

রাসূলুল্লাহ (সা.) যাবতীয় নামাযের দুই রাক'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। আর ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে ও বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে বসতেন। (সহীহ মুসলিম ১/১৯৪ হা. ৪৯৮)

সংশয় ও নিরসন

মুসলিম শরীফসহ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি যাতে প্রথম বৈঠকে বসা ওয়াজিব বোঝা যায়। কিন্তু কিছু অপরিপক্ব শিক্ষিত লোক কয়েকটি সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার আলোকে বিত্রের প্রথম বৈঠকে বসার প্রয়োজন নেই বলে প্রচার করে যাচ্ছে। তাই ওই হাদীসগুলো উল্লেখ করে এর সঠিক সমাধান পেশ করা প্রয়োজন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত–

كان رسول الله ﷺ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس فى شئ إلا فى آخرها۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে তের রাক'আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত বিত্র পড়তেন। এরপর কোনো স্থানে বসতেন না। বরং সর্বশেষে বসতেন। (মুসলিম ১/২৫৪ হা. ৭৩৭)

নিরসন

হাদীস সহীহ। তবে বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন কিতাবের অসংখ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) তিন রাক'আত বিত্র পড়েছেন। অংশ বিশেষ আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া প্রতি দুই রাক'আতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বসতেন, মুসলিম শরীফের হাদীসটি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সব সহীহ হাদীসের দ্বারা তিন রাক'আতের কমবেশি বিত্র পড়ার হাদীস এবং প্রথম বৈঠক না করার হাদীসগুলো রহিত বলে গণ্য হয়েছে।

এ ছাড়া বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, বস্তুত হাদীসে রাসূল (সা.)-এর রাতের তের রাক'আত নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতি দুই রাক'আত পড়ার পর সালাম ফিরিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসতেন। শেষ পাঁচ রাক'আত পড়ার পদ্ধতি এর ব্যতিক্রম ছিল। দুই রাক'আত পর সালাম ফিরিয়ে তখন আর বিলম্ব করেননি। বরং তাৎক্ষণিক দাঁড়িয়ে বিত্রের নিয়ত করেন এবং বিত্র যথাযথভাবে (প্রথম বৈঠকসহ) সমাপ্ত করে পূর্বের ন্যায় দীর্ঘ বৈঠক করেন। এই ব্যাখ্যা না করা হলে অথবা এই হাদীসগুলো রহিত হিসেবে গণ্য না করা হলে প্রথম বৈঠক সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে। তাই হাদীসের এই সঠিক মর্ম অবশ্যই মানতে হবে। (ইখতেলাফে উম্মত পৃ. ৩৪৫)

বিত্র নামাযের মধ্যে সালাম ফিরালে নামায ভেঙে যায়

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল যাবতীয় নামায শেষ করে সালাম ফেরাতে হয়। তাই তিন রাক'আত বা চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর সালাম ফেরালে নামায ভেঙে যাবে। ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে। এ মর্মে মহানবী (সা.) থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। একটি হাদীস নিম্ন রূপ:

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

নামাযের প্রারম্ভ হলো পবিত্রতা, তাকবীর বলা মাত্রই নামাযবিহীন কর্ম নিষিদ্ধ হয়। আর সালাম ফেরানোর পর নামাযে যা নিষিদ্ধ ছিল তা আর নিষিদ্ধ থাকে না। (আবু দাউদ ১/৯ হা. ৬১)

এছাড়া মহানবী (সা.) বিত্র নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফেরাননি। বরং তৃতীয় রাক'আত শেষে সালাম ফেরাতেন এমন বর্ণনাও রয়েছে অনেক। কয়েকটা নিম্নরূপ–

عن عائشة رضى أن رسول الله ﷺ كان لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বিত্র নামাযের দুই রাক'আত পর সালাম ফেরাতেন না।"

তিনি আরো বলেন–

كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم الا فى آخرهن

রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন রাক'আত বিত্র পড়তেন, নামায শেষ হওয়ার পূর্বে সালাম ফেরাতেন না।" (হাদীস দুটির সূত্র, মুসতদারাকে হাকেম ১/৩০৪ হা. ১১৩৯ ও ১১৪০, ইমাম হাকেম ও যাহাবী হাদীস দুটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।)

সংশয় ও নিরসন

সাম্প্রতিক কালে কিছু লোক বিত্র নামায তিন রাক'আত পড়ে ঠিকই। কিন্তু তারা দুই রাক'আত পর সালাম ফিরিয়ে অবশিষ্ট এক রাক'আত ভিন্নভাবে পড়ে থাকে। তাদের সংশয় হলো হাদীসে এভাবে করার অনুমতি আছে। এ বিষয়ে তাদের অন্যতম দলিল হলো-

عن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وأخبر ابن عمر أن النبى ﷺ كان يفعل ذلك۔

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বিত্রের দুই রাক'আত এবং এক রাক'আতের মধ্যে সালাম ফিরিয়ে নামাযকে পৃথক বা দুই ভাগে ভাগ করে নিতেন। আর তিনি উল্লেখ করেন, রাসূল (সা.) এমন করতেন। (ত্বাহাবী ১/২৭৯)

নিরসন

ইতিমধ্যে আমরা বিত্র নামায তিন রাক'আত এবং এর মধ্যে সালাম ফেরানো যাবে না, এমন কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি। তাই বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ইমামগণের মতামত হলো, ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে কথা বলা ও সালাম আদান-প্রদানেরও অনুমতি ছিল। তখন বিত্র নামাযে সালাম ফেরানো এবং এক রাক'আত পড়া সবই বৈধ ছিল। (বুখারী হা. ১১৯৯, মুসলিম হা. ৫৩৮) পরবর্তীতে তিন রাক'আতের অসংখ্য বর্ণনা এবং সালাম না ফেরানোর বর্ণনার মাধ্যমে এ সবই রহিত হয়ে গেছে। (কিতাবুল হুজ্জা টিকা ১/১৯১)

এ ছাড়া উল্লিখিত সালাম ফেরানোর হাদীসে জনৈক বর্ণনাকারী ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম, যার সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী লেখেন مدلس وربما دلس عن الكذابين "মুদাল্লিস (ধোঁকাবাজ) বর্ণনাকারী, কখনো মিথ্যুক থেকে তাদলীস (কৌশলে) বর্ণনা করে।" (মীযানুল ই'তিদাল ৪/৩৪৭, হা. ৯৪০৫)

দু'আয়ে কুনুত রুকুর পূর্বে পড়াই ওয়াজিব

বিত্র নামাযে দু'আয়ে কুনুত শেষ রাক'আতে রুকু করার পূর্বে হবে নাকি পরে হবে এ বিষয়ে কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সংশয়ে নিপতিত আছে। অথচ সহীহ হাদীসে শুধুমাত্র রুকুর পরে দু'আয়ে কুনুত পড়ার কথাই পাওয়া যায়।

এ পরিসরে কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

১. তাবেয়ী আসেম আল আহওয়াল বলেন,

سألت انس بن مالك رض عن القنوت فى الصلاة فقال : نعم، فقلت: كان قبل الركوع او بعده؟ قال: قبله قلت: فان فلانا اخبرنى عنك انك قلت: بعده قال : كذب انما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرا۔

হযরত আনাস (রা.) নামাযে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, কুনুত কি রুকুর পূর্বে হবে না, পরে? উত্তরে তিনি বলেন, রুকুর পূর্বে হবে।

আমি বললাম, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আপনি রুকুর পর কুনুত পড়ার কথা বলেছেন। আনাস (রা.) বলেন, সে মিথ্যা বলেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু এক মাস রুকুর পর কুনুতে নাযেলা পড়েছিলেন। (বুখারী ২/৫৮৭ হা. ৪০৯৬, মুসলিম ১/২৩৭ হা. ৬৭৭)

২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله ﷺ كان يوتر ويقنت قبل الركوع

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত বিত্র পড়তেন। তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। (নাসাঈ ১/২৪৮, হা. ১৬৯৮)

৩. হযরত আলকামা (রা.) বলেন,

أن ابن مسعود وأصحاب النبى ﷺ كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্য সাহাবীগণ বিত্র নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩০২ হা. ৬৯৮৩)

৪. নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতামত :

লা-মাযহাবীদের অন্যতম গবেষক অল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন–

إنه قد صح عنه ﷺ أنه قنت فى الوتر قبل الركوع ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة

সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) বিত্র নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। এর উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে অসংখ্য উক্তি ও আমল রয়েছে। (ইরওয়াউল গালীল আলবানী ২/১৬৪)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত তা হলো দু'আয়ে কুনুত রুকুর পূর্বে।

সংশয় ও সমাধান :

কয়েকটি দুর্বল বর্ণনার আলোকে একটি মহল দাবি করে থাকে যে, রুকুর পরে হবে দু'আয়ে কুনুত। এ ছাড়া অধিকাংশ বর্ণনা অস্পষ্ট, এতে উল্লেখ নেই কুনুত বিত্র নামাযে পড়েছেন নাকি অন্য কোনো নামাযে পড়েছেন। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা মতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মাত্র এক মাস ফজর নামাযে রুকুর পর কুনুতে নাযেলা পড়েছেন, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। তাই লা-মাযহাবী মতবাদের গবেষক আল্লামা আলবানী লেখেন,

وهذه الأحاديث كلها فى القنوت فى المكتوبة فى النازلة

রুকুর পরে কুনুত পড়া সম্পর্কীয়

যাবতীয় হাদীস ফরয নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (ইরওয়া ২/১৬৩)

দু'আয়ে কুনুতের পূর্বে তাকবীর বলে দু'হাত উঠানো সুন্নাত

দু'আয়ে কুনুতের পূর্বে তাকবীর বলে দু'হাত উঠানোর বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য আমল পাওয়া যায়। কয়েকটি নিম্নরূপ :

عن عبد الله انه كان يرفع يديه إذا قنت فى الوتر

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বিত্র নামাযে কুনুতের প্রারম্ভে দু'হাত তুলে তাকবীর বলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৭ হা. ৭০২৮. হা. সহীহ)

عن الأسود أن عبد الله مسعودؓ كان إذا فرغ من القرآءة كبَّر ، ثم قنت فإذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع

আসওয়াদ বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) বিত্র নামাযে শেষ রাক'আতে কেরাত সমাপ্ত করে তাকবীর বলতেন। অতঃপর কুনুত পড়তেন। কুনুত সমাপ্ত হলে তাকবীর বলে রুকু করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৩০৭, হা. ৭০২১, হা. সহীহ)

দু'আয়ে কুনুত

কুনুত শব্দের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য। আর দু'আয়ে কুনুত বলতে যে দু'আ আনুগত্য প্রকাশ করে তাকেই দু'আয়ে কুনুত বোঝায়। তবে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিত্র নামাযের শেষ রাক'আতে যে দু'আটি পড়া হয় তাকেই দু'আয়ে কুনুত বলা হয়। উল্লেখ্য, দু'আয়ে কুনুত হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো দু'আ পড়া ওয়াজিব নয়। বরং আপন আপন সাধ্যানুযায়ী কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত যেকোনো দু'আ পড়লে দু'আয়ে কুনুত হিসেবে যথেষ্ট হবে। এতে কোনো মতানৈক্য নেই। (ইলাউস সুনান ৬/১১১, ১১২)

এ পরিসরে আলোচনার বিষয় হলো, একটি মাত্র দু'আ দু'আয়ে কুনুত হিসেবে হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, যা আমাদের উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে চলে আসছে। তা হলো নিম্নরূপ।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ اَلْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِيَاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) লেখেন, উল্লিখিত এই দু'আয়ে কুনুতটি প্রাধান্যযোগ্য বিভিন্ন কারণে। বিশেষ একটি কারণ হলো, একমাত্র এই দু'আটি দু-একটি শব্দের ব্যবধানে কয়েকটি হাদীসে দু'আয়ে কুনুত হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ।

بينما رسول الله ﷺ يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت ثم علمه هذا القنوت اللّٰهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك....

কোনো একদিন মহানবী (সা.) মুজার গোত্রের প্রতি বদদু'আ করতে ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে চুপ হওয়ার ইঙ্গিত করেন। অতঃপর কিছু কথা বলে আগত দু'আয়ে কুনুতটি শিক্ষা দেন। "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...)

(আবু দাউদ, মারাসিল ১১৮ হা. ৮৯)

একই ধরনের কয়েকটি হাদীসের কারণে হাদীসটি হাসান বা উত্তম পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য। (ইলাউস সুনান ৬/১০৯)

এই হাদীসে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য, তা হলো, এতে উল্লেখ আছে এই দু'আটি জিবরাইল (আ.) নিজে এসে রাসূল (সা.)-কে দু'আয়ে কুনুত হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আর কোনো দু'আর ক্ষেত্রে ঘটেনি। তাই এই দু'আটি দু'আয়ে কুনুত হিসেবে শ্রেষ্ঠ।

হযরত আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

علمنا ابن مسعود أن نقرأ فى القنوت اللّٰهم إنا نستعينك ونستغفرك

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদের দু'আয়ে কুনুত হিসেবে আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা..." এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন। (ইবনে আবী শাইবা ২/৩০১ হা. ৬৯৬৫)

ইমাম যফর আহমদ উসমানী (রহ.) লেখেন, এই হাদীসে আতা ইবনে সায়েব নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। তবে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে আসার কারণে সহীহ পর্যায়ে গণ্য হবে। (ইলাউস সুনান ৬/১০৯)

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) এবং আলী (রা.) এই দু'আয়ে কুনুত পড়তেন বলে বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাই এই দু'আটিই দু'আয়ে কুনুত হিসেবে পড়া শ্রেষ্ঠ বলে বোঝা যায়। (দেখুন ইবনে আবী শায়বা ১০/৩৮৮ হা. ৩০৩৩৫, ১০/৩৮৯ হা. ৩০৩৩৭)

সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ!

আপনাদের খেদমতে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে বিত্র নামাযের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও তথ্যবহুল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। পেশ করেছি নতুন করে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক গোলক ধাঁধার সঠিক সমাধান। আমরা আশা করি, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী সঠিকভাবে বিত্র নামায আদায়ের সোনালি স্বপ্ন বুকে ধারণ ও লালন করেন তাদের জন্য বক্ষমাণ এই প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ সহায়ক হবে। হবে সঠিক তথ্য গবেষণার প্রতি প্রেরণা ও অনুপ্রেরণার উৎস। সত্যানুসন্ধানের জন্য হবে শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীম অবলম্বন করার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৩

আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কি না? তাঁরা সত্য পথের ওপর ছিলেন, এ কথা তো সবাই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে। লা-মাযহাবীরা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব অকথ্য এবং অশ্রাব্য মন্তব্য করেছে, যা কোনো সাধারণ মুসলমানের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের অশালীন মন্তব্যগুলো তাদেরই রচিত গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করতে আমরা চেষ্টা করব।

'হাদিয়াতুল মাহদী', লা-মাযহাবীদের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। লেখক ওয়াহীদুজ্জান হায়দারাবাদী। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন,

فان كثيرا من متاخرى علماء هذه الامة كانوا افضل من عوام الصحابة فى العلم والمعرفة ونشر السنة وهذا مما لاينكره عاقل۔

অর্থ : এই উম্মাহর পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এমন অনেক আলেম আছেন, যারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে অনেক সাধারণ সাহাবী থেকে উত্তম। এ কথাকে অস্বীকার করা কোনো বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। (খণ্ড-১, পৃ.-৯০)

একই গ্রন্থে লেখেন,

لكنه يمكن لبعض الاولیا وجوه اخرى من الفضيلة

অর্থ : অনেক অলী এমন গুণাগুণে ভূষিত হতে পারেন, যা সাহাবীর মধ্যে নেই। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

لا يقال تفضيل الشيخين مجمع عليه حيث جعلوه من امارات اهل السنة لا نا نقول دعوى الاجماع غير مسلم

অর্থ : যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শায়খাইনের (হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) শ্রেষ্ঠত্বের ওপর উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যুত্তরে আমরা বলব, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই দাবি করা অগ্রহণযোগ্য। (প্রাগুক্ত)

ওই গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে,

غير ان هذه الفضيلة للجمهور على الجمهور لا لكل فرد من افراده

অর্থ: সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই বিধান স্বতন্ত্রভাবে সব সাহাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (খণ্ড-১, পৃ.-১০৫)

একই গ্রন্থকারের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে লুগাতুল হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে,

ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کام کئے ہیں جو شرعا اور عقلا ہر طرح مذموم ہیں

অনেক সাহাবী থেকে এমন কাজও সংঘটিত হয়েছে, যা শরীয়ত এবং যুক্তি, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দিত এবং অগ্রহণযোগ্য। (খ.-২ পৃ.-৫৬৪)

অন্যত্র আছে,

مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ خلفاء کا فعل بھی سنت ہے ، سنت تو آنحضرت ہی کا قول وفعل ہے کیونکہ آپ خطا سے معصوم تھے اور آپ کے خلفاء معصوم نہیں

অর্থাৎ খোলাফাদের কাজকর্ম এবং কথাবার্তা সুন্নাত নয়। (পৃ. ১০৯)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہ اور عمرو بن العاص دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے اور دونوں صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روا نہیں بلکہ صرف صحابیت کا لحاظ کر کے ان کے ذکر کو سب وشتم سے پاک رکھنا ہی کافی ہے۔

অর্থাৎ এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই যে, মু'আবিয়া এবং আমর ইবনুল আ'স উভয়জন রাষ্ট্রদ্রোহী এবং কুচক্রী ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের গুণকীর্তন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। সাহাবী হওয়ার কারণে তাদের গালমন্দ না করাটাই যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত পৃ. ৭০)

তাদের আক্বীদা দেখুন,

ان لوگوں کو یہ معتبر تاریخی روایات نہیں پہنچیں کہ معاویہ برسر منبر حضرت علی کو برا کہا کرتے تھے بلکہ دوسرے خطیبوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر خطبہ میں جناب امیر کو برا کہیں معاذ اللہ ان پر لعنت کرتے رہیں، سچی بات یہ ہے کہ معاویہ پر دنیا کی طمع غالب ہوگئی تھی اور وہ حضرت علی کو منبر پر لعنت کیا کرتے جیسے ابن جریر محمد نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور امام حسن نے معاویہ سے جس شروط پر صلح کی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کی حضرت علی کو ان کے سامنے روبرو برا نہ کہیں گے اور حضرت علی کیا معاویہ کو تمام خاندان رسالت سے دلی دشمنی تھی۔

তাদের কাছে ইতিহাসের এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পৌঁছেনি যে, মু'আবিয়া মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলীর বিষোদগার করতেন বরং খতীবদের প্রতি তার নির্দেশ ছিলো, খুতবায় যেন হযরত

আলীর সমালোচনা করা হয় এবং তাঁর ওপর অভিসম্পাত করা হয়। বাস্তব কথা হচ্ছে, মু'আবিয়া পৃথিবীর মোহে পড়েই হযরত আলীর বিষোদগার করতেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তার ইতিহাস গ্রন্থে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান (রা.) মু'আবিয়ার সাথে যেসব শর্তের ওপর চুক্তি করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত ছিল, তিনি জনসম্মুখে হযরত আলীর (রা.) সমালোচনা করবেন না। বাস্তব কথা হচ্ছে, শুধু হযরত আলীর সাথে নয়, বরং পুরো আহলে বাইতের সাথে মু'আবিয়ার শত্রুতা ছিল। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থে আছে,

لا تسبوا اصحابی (اسی حدیث کے بموجب گو معاویہ اور مغیرہ اور عمر بن العاص اور سمرہ بن جندب اور ابوسفیان اور مروان کے بعض اعمال مہلک ہیں مگر انکو برا کہنے سے اپنی زبان کور کے رہتے ہیں۔

তোমরা আমার সাহাবীদের বিষোদগার করো না।এই হাদীসের চাহিদা হলো, কোনো সাহাবী সম্পর্কে সমালোচনা না করা। যদিও মু'আবিয়া, মুগীরা, সামুরা, আমর, আবু সফিয়ান এবং মারওয়ানের অনেক কর্মকাণ্ডই ঈমানবিধ্বংসী। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থকারের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে, 'কানযুল হাকায়িক মিন ফিকহি খায়রিল খালায়িক'। সেখানে বলা হয়েছে,

ويستحب الترضى للصحابى غير ابى سفيان ومعاية وعمرو بن العاص ومغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب۔

আবু সুফিয়ান, মু'আবিয়া, আমর, মুগীরা এবং সামুরা, এই পাঁচজন ছাড়া অন্য সব সাহাবীর ক্ষেত্রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলা মুস্তাহাব। (পৃ. ২৩৪)

এই ওয়াহীদুজ্জামান, যে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন মারাত্মক মন্তব্য করেছে তার সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে,

اعتراف حقیقت کے طور پر یہ تسلیم ہے کہ نواب وحید الزمان کے قلم سے بعض اوقات بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں صادر ہوگئی ہیں جو نا مناسب ہیں نہیں صادر ہونا چاہئے۔

বাস্তবতা স্বীকারপূর্বক বলতে হচ্ছে, অনেক সময় নবাব ওয়াহীদুজ্জামানের কলম থেকে কিছু সাহাবী সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে , যা সমুচিত হয়নি। (ড. ইদরীস মুবারকপুরী কর্তৃক রচিত সালাফিয়্যাত কা তা'আরুফ নামক গ্রন্থের পার্শ্বটিকায় মুক্তাদা হাসান আযহারী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পৃ. ৩৪০)

বন্ধুরা! অপরাধ কত গুরুতর! আর অজুহাত কত লঘু। একেই বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ অপপ্রয়াস।

লা-মাযহাবীদের আরেক পুরোধা 'মুহাম্মদ সাহেব জোনাগড়ী' রচনা করেন 'শাময়ে মুহাম্মদী'। ওই গ্রন্থের কয়েকটি শিরোনাম হচ্ছে,

حضرت فاروق کی سمجھ کا معتبر نہ ہونا، صحابہ کی درایت معتبر نہیں

অর্থ: হযরত ওমরের ফাহম এবং সাহাবীদের দেরায়ত (তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বোধশক্তি) গ্রহণযোগ্য নয়। (পৃ. ১৯)

লা-মাযহাবীদের অন্যতম গুরু 'মু. নজীর হোসাইন দেহলভী' রচনা করেন 'ফাতাওয়ায়ে নজীরিয়্যাহ'। সেখানে বলা হয়েছে,

فہم صحابہ حجت شرعیہ نہیں کما ثبت فی اصول الحدیث

সাহাবীর মতামত শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (খ. ১, পৃ. ৬২২)

লা-মাযহাবীদের ফাতাওয়া সংকলন 'ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীসে' বলা হয়েছে,

ڈاڑھی کے متعلق مندرجہ تین صحابہ کرام سے امر نبوی منقول ہے (۱) حضرت ابن عمر (۲) حضرت ابوھریرہ (۳) حضرت ابن عباس، اگر چہ ہمارے نزدیک قابل عمل راوی کی درایت نہیں بلکہ رسول اللہ کی روایت ہے۔

অর্থাৎ, দাড়ি সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে তিনজন সাহাবী আদেশসূচক বাণী বর্ণনা করেছেন। ১. হযরত ইবনে উমর (রা.), ২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.), ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)। যদিও আমাদের মতে বর্ণনাকারীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, বরং রাসূল (সা.)-এর হাদীসই আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য। (পৃ. ৪৯৬)

তাদেরই আরেকটি গ্রন্থ 'আরফুল জাদিতে' বলা হয়েছে,

دراصول تقرر شدہ کہ قول صحابہ حجت نیست

হাদীসের মূলনীতিতে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো সাহাবীর মতামত বা উক্তি শরীয়তের প্রমাণ নয়। (পৃ. ১০১০) এই অশ্রাব্য মন্তব্যও করা হয়েছে সেখানে,

بلکہ بعض اہل علم ایں استمناء از صحابہ نزد غیبت از اہل خود کردہ اند

অর্থাৎ, হস্তমৈথুন বৈধ হওয়ার তারা দলিল দিচ্ছে, অনেক সাহাবী যখন স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করতেন তখন হস্তমৈথুন করতেন। (নাউজুবিল্লাহ) (পৃ. ২০৭)।

'ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীস' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে,

کہ روایت اصل میں ابوہریرہ کا فعل ہے جو عمار بن یاسر کیطرح عملی غلطی ہے۔

অর্থ : এই বর্ণনাটি মূলত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিজস্ব কর্ম, রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়, যা আম্মার ইবনে ইয়াছিরের মত কর্মগত ভুল বলে বিবেচনা করা হবে। (পৃ. ৫০৬)

'ফাতাওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস' নামক

গ্রন্থের ৬ নং খণ্ডে বলা হয়েছে,

صحابی کا عمل دلیل نہیں ہوتا۔

অর্থাৎ, সাহাবীর কর্ম শরীয়তের দলিল নয়। (পৃ. ৩৭২)

'আমীনুল্লাহ পেশাওয়ারী' কর্তৃক রচিত 'ফাতাওয়াদ্দীনিল খালিস' প্রথম খণ্ডে আছে,

উদাহরণস্বরূপ ছমুরা শরাবের ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ মনে করতেন। আবু তালহা রোযাদারের জন্য উল (এক প্রকার মিষ্টি দ্রব্য) খাওয়া বৈধ মনে করতেন। উসমান, আলী, তালহা এবং ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবী জুনুবীর (যার ওপর গোসল ফরজ) জন্য তায়াম্মুম অবৈধ মনে করতেন। হায়েজ অবস্থায় যেসব নামায ছুটে যায়, তা পুনরায় পড়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। ছামুরা ইবনে জুনদুব হযরত আবু বকর (রা.) স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) হাবশার মুহাজিরদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমরা রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। কিন্তু নবী (সা.) তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। হযরত বেলাল (রা.) এক ছা' খেজুর দুই ছা' (২৮০ তোলার ওজন বিশেষ। প্রায় সাড়ে তিন সের পরিমাণ ওজন) খেজুরের পরিবর্তে বিক্রি করেন। পরে অবশ্যই রাসূল (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আদী (রা.) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত খায়তে আবয়ায দ্বারা উদ্দেশ্য সাদা সুতো মনে করেছিলেন। এই ধরনের আরো অনেক বর্ণনা ইমাম ইবনে হাজম (রহ.) আহকাম নামক গ্রন্থে (খ.-৬, পৃ.-৮২-৯১) উল্লেখ করেছেন।

এখন বলুন, সাহাবায়ে কেরামদের যে ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল, সেগুলোতে কি তাদের অনুসরণ করা যাবে? (খ. ১ পৃ. ২৫১) লা-মাযহাবীদের প্রধান গুরু 'সানাউল্লাহ আমরতছরী' 'ফাতাওয়ায়ে ছনাইয়্যায়' উল্লেখ করেন যে,

ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا آنحضرت کا کلمہ پڑھا ہے۔

আমরা ফারুকী নয়, বরং মুহাম্মদী, আমরা তার কালিমার পাঠ করিনি, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর কালিমা পাঠ করেছি। (খ. ২, পৃ. ২৫২)

লা-মাযহাবীদের আরেক পুরোধা ফয়েজ আলম সিদ্দিকী সাইয়িদুনা হাসান ইবনে আলী নামক গ্রন্থে লিখেছেন।

کیا حضرات حسنین صحابی تھے؟ آج ہر مسلمان اندھا دھند اس بات کی رٹ لگائے جا رہا ہے کہ حضرات حسنین صحابی تھے

হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) কি সাহাবী ছিলেন? বর্তমানে প্রায় সব মুসলমান এই অন্ধ বিশ্বাসে মত্ত যে, হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) সাহাবী ছিলেন। (পৃ. ২০)

একই গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ان حقائق وشواہد کی روشنی میں حضرات حسنین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا صریحا سبائیت کی ترجمانی ہے، یا اندھا دھند تقلید کی خرابی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات حسنین کو زمرۂ تابعین میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔

এসব বাস্তবতা এবং প্রমাণাদির পরও হযরত হাসান হোসাইনকে সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা স্পষ্টত সাবায়ীদের দালালি করারই নামান্তর অথবা এটা অন্ধ অনুকরণেরই বিষফল। অন্যথায় স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা হচ্ছে, হযরত হাসান হোসাইন (রা.) তাবেঈনদেরই অন্তর্ভুক্ত। (পৃ. ২৩)

ওই বেয়াদব আরো লিখেছে,

حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسن کو اپنی ماں کا دودھ پینے کا موقعہ نہ ملا تھا آپ کی پرورش دوسرے دودھ پر ہوئی تھی اس لئے صحبت کے لحاظ سے آپ کمزور تھے اور کما حقہ نشو ونما نہ پا سکے تھے اس پر کثرت سے حرم کی زندگی کے دلدادہ تھے جس کی وجہ سے آپ کو بعض روایات کے مطابق آخری ایام میں سل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔

বাস্তব কথা হচ্ছে, হযরত হাসান (রা.) নিজ মায়ের দুধ পান করার সুযোগ পাননি। তার লালন-পালন অন্যের দুধ দিয়ে হয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যের দিক থেকে তিনি একটু দুর্বল ও রোগা টাইপের ছিলেন। সাথে সাথে তিনি হেরেমের আড়ম্বর ও জৌলুসপূর্ণ বিলাসী জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন। এ জন্য বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি শেষ জীবনে ফুসফুসের ক্ষতে আক্রান্ত ছিলেন। (পৃ. ৮০) (নাউযুবিল্লাহ)

লা-মাযহাবীদের আরেকটি মৌলিক গ্রন্থ ফয়জ আলম সিদ্দিকী কর্তৃক রচিত খেলাফতে রাশেদা। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন,

مگر حضرت علی شرف ومجد کے بلند مقامات پر فائز ہونیکے باوجود تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نقش چھوڑنے پر قادر نہ ہو سکے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ آپ بھی خلیفہ حق تھے۔

কিন্তু হযরত আলী (রা.) সম্মান ও মর্যাদার অনেক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেও ইসলামের ইতিহাসে তার এমন কোনো প্রোজ্জ্বল ভূমিকা নেই, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনিও একজন সত্যনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন। (পৃ. ১৪)

ওই গ্রন্থের অন্য জায়গায় আছে,

اور ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی کے نام نہاد دور خلافت میں صحابہ کرام اور تابعین کے گروہ کے گروہ عراق اور حجاز سے بھاگ کر شام میں رہائش پذیر ہو رہے تھے۔

আমরা দেখতে পাচ্ছি, হযরত আলীর তথাকথিত খেলাফতামলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনরা দলে দলে ইরাক এবং হেজাজ পরিত্যাগ করে সিরিয়ায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিলেন। (পৃ. ৩৯)

ওই গ্রন্থে আরো আছে,

اس امر کی روشنی میں یہ کہنا کہ سیدنا ذوالنورین کی شہادت عظمی کے بعد سیدنا علی ہی صحیح

معنوں میں خلافت کے حقدار تھے ایک قسم کا تاریخی مذاق اور تاریخ نویس کا مسخرہ پن ہے۔

উল্লিখিত কথার আলোকে এই মন্তব্য করা, হযরত উসমান (রা.)-এর মর্মন্তুদ শাহাদতের পর হযরত আলীই প্রকৃত অর্থে খেলাফতের যোগ্য ছিলেন। ঐতিহাসিকদের ভাঁড়ামি আর উপহাস বৈ কিছুই নয়। (পৃ. ৬২)

একই গ্রন্থে আছে,

پھر یہ کہاں کی علمیت اور دینداری ہے کہ حضور صادق ومصدوق کے جواں سال نواسوں کو چھوڑ کر جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل تھا حضرات حسنین کو جمعہ کے خطبات میں سید شباب اہل الجنۃ اور سیدین الشہیدین وغیر خطابات سے نوازا جائے۔

এটি কোন ধরনের জ্ঞান ও ধার্মিকতা যে, রাসূল (সা.)-এর অন্য পরিণত দৌহিত্রদের আলোচনা বাদ দিয়ে, যারা সাহাবী হওয়ার বিরল মর্যাদায়ও ভূষিত ছিলেন, জুমুআর খোতবায় হযরত হাসান এবং হোসাইনকে জান্নাতের যুবকদের অধিপতি এবং সৌভাগ্যবান শহীদের অভিধায় বিশেষিত করা? (অর্থাৎ এটা একেবারে অযৌক্তিক ও অনুচিত) (পৃ. ১১৫)

سیدنا حسن کے موت کے متعلق میں اپنی تالیفات عترت رسول اور حسن بن علی میں بدلائل ثابت کر چکا ہوں کہ کثرت جماع، ذیابیطس اور تپ محرقہ سے ہوئی، آپ کہاں شہید ہوئے

আমি আমার একাধিক গ্রন্থে যথা ইতরাতে রাসূল (সা.), হাসান ইবনে আলী (রা.), এ কথা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, হযরত হাসান (রা.) অধিক স্ত্রী সহবাস, বহুমূত্র রোগ এবং পালা জ্বরের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি শহীদ হলেন কোথায়? (পৃ. ১১৫)

একই গ্রন্থে আছে,

دوسرے نمبر پر حضرت ابوذر غفاری کا نام ہے جو ابن سبا کے کمیونسٹ نظر سے متاثر ہو کر ہر کھاتے پیتے مسلمان کے پیچھے لٹھ لیکر بھاگ اٹھتے تھے۔

দ্বিতীয় নাম্বারে হযরত আবু জর গেফারীর নাম, যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার (মুনাফিকদের সর্দার) কমিউনিস্ট মতবাদে প্রবাবিত হয়ে প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানদেরকে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। (পৃ. ১৪৩)

'শাহাদতে সায়্যিদুনা জিন্নুরাইন' (রা.) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা থেকে এ কথা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়ে গেল যে, হযরত ফারুক আজম (রা.)-এর বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা আন্দোলন সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী জ্ঞাত ছিলেন এবং তারা যথাসম্ভব তাকে ইশারা-ইঙ্গিতে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবী কেন হযরত উমর (রা.) কে স্পষ্টভাবে এ কথাটি খুলে বলেননি? এ থেকে কি এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, এর পেছনে একটি বড় শক্তির হাত ছিল? ওই ষড়যন্ত্রের রহস্য আজও পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে। (পৃ. ৩২)

অন্যত্র বলা হয়েছে, এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হন্তারক কারা ছিলো, তা সবার জানা ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়, শুধু হযরত আলী (রা.) তাদের সম্পর্কে ছিলেন ঘোর অন্ধকারে! অথচ সব ঘটনার অকুস্থল ছিল তার সামনে। হযরত আলী (রা.) যদি খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার সাথে সাথে ওই সব গুটিকয়েক বিশৃঙ্খলাকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতেন, তাহলে তিনিও তাঁর পূর্বসূরিদের মতো শান্তির সাথে রাজ্য পরিচালনা করতে পারতেন। তার অবহেলার দরুন বিশৃঙ্খলাকারীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে তারাই হযরত আলী (রা.) কে শহীদ করে ফেলে। তাদের কারণেই হযরত হাসান (রা.) লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। হযরত হোসাইন (রা.)-এর মর্মন্তুদ শাহাদতের পেছনেও তাদের কালো হাত ছিল বলে প্রায় সব ইতিহাসবেত্তা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ইয়াযিদের প্রতি অভিযোগের তীর তোলা হয়, তিনি হযরত হোসাইন (রা.)-এর হন্তারকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না কেন? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজ পর্যন্ত কোনো পক্ষ এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, হযরত আলী (রা.) হযরত উসমানের (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিলেন না কেন? হযরত হোসাইন (রা.)-এর হত্যায় যারা সম্পৃক্ত ছিল, ইয়াযিদ তাদেরকে নিজের দরবার থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। অন্যদিকে হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে বড় বড় লোভনীয় পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। (পৃ. ৭৪)

তাহকীকে শাহাদতে হোসাইন নামক গ্রন্থে লা-মাযহাবীদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ফয়েজ আলম সিদ্দিকী লিখেছেন, অগ্নিপূজকদের ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত উমর (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) ও ইয়াহুদী অগ্নিপূজকদের সমন্বিত ষড়যন্ত্রে শহীদ হন। পরবর্তীতে তারাই হযরত আলী (রা.)-কে আত্মরক্ষার্থে খেলাফতের মসনদে সমাসীন করেন। (পৃ. ২)

একই গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে, হযরত হোসাইন (রা.) সর্বপ্রথম কুফা সফর করেন। পরে তিনি স্বীয় মনোভাব পরিবর্তন করে কুফা থেকে ফিরে আসতে মনস্থ হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাটা কি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে না যে, তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার

মানসে কুফা সফর করেননি। বরং সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়াটাই ছিল তাঁর প্রধান টার্গেট। (পৃ. ১৮)

লা-মাযহাবীদের আরেক গুরুজি 'মুহাম্মদ ইসহাক'-এর বক্তৃতা সংকলন 'খোতবাতে ইসহাক' থেকে সাহাবা বিদ্বেষের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এক জায়গায় বলা হয়েছে, হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামল ছিল ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এক বিভীষিকাময় যুগ। তার যুগে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় হয়তো ধ্বংস, নয়তো বিকৃত হয়ে যায়। তার শাসনামলে হযরত হুজর ইবনে ওয়ায়েল (রা.)-এর মতো রাসূলের প্রিয় সাহাবীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। হাকম ইবনে গিফারী (রা.)-এর মৃত্যুই হয়েছে এই দু'আ করা অবস্থায়, হে আল্লাহ! আমার ভাগ্যে যদি সামান্য হলেও কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নাও। (পৃ. ৮)

মু'আবিয়ার শাসনামলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাকে কতবার মিনতি করলেন যে, হে মু'আবিয়া! রাসূলের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করো। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী! মু'আবিয়ার সরাসরি উত্তর–না।

ওই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে খবীস (ভ্রষ্ট) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (পৃ. ১৪,১৫)

একই গ্রন্থে বলা হয়েছে, সালেহ ইবনে মাহদী নামক জনৈক সালাফী আলেম লিখেছেন যে, লোকেরা হযরত আলী এবং মু'আবিয়ার মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা করতে গিয়ে বলে যে, মু'আবিয়ার ইজতিহাদ (গবেষণা ও দর্শন) ভুল ছিল। অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে অনেক খোঁড়া অজুহাত উপস্থাপন করা হয়। আমি বলি, এগুলো কিছু নয়। এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করা যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই নামান্তর। বাস্তব কথা হচ্ছে, মু'আবিয়া ছিল ইতিহাসের এক খলনায়ক। তার ক্ষমতালিপ্সা ছিল সর্বজনবিদিত। তার কাছে ধর্মের কোনো গুরুত্বই ছিল না। সে নিজেও দ্বীন-ধর্ম থেকে যোজন যোজন দূরত্বে ছিল। ক্ষমতার লাভের জন্য সব ধরনের শত্রুতা, ধূর্তামি, প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি ছিল তার কাছে ডাল-ভাতের মতো সহজ। এমন কোনো ইতরামি আর অন্যায় ছিল না, যা সে ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়নি। সর্বশেষ ইয়াযিদকে ওলী আহদ (খেলাফতের উত্তরাধিকারী) নির্বাচন করার মাধ্যমে ইসলামের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। প্রথম প্রথম সে সাহাবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত এবং লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাদেরকে যে সে কত ঘুষ দিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। চার বছর পূর্ব থেকে তার বায়আত হতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা আরম্ভ করে। (পৃ. ১৭)

আল্লাহ সাক্ষী! মু'আবিয়ার শাসনামলে ইসলামের ওপর যে ভয়ানক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে, তার কোন অংশে কেয়ামত থেকে কম নয়। কিন্তু এর পরও লোকেরা কেন তার গুণকীর্তন করে, তা বোধগম্য নয়। (পৃ. ৪৫)

'তানবীরুল আফাক ফী মাসআলাতিত্তালাক' লা-মাযহাবীদের মৌলিক একটি প্রামান্য গ্রন্থ। লেখক, মুহাম্মদ রঈস নদভী। ওই গ্রন্থের এক স্থানে লেখক তালাকের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি এক স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা যে, কোনো সাহাবী এ কথা দাবি করেননি যে, একসাথে তিন তালাক পতিত হওযার ফাতাওয়া কুরআন-হাদীসের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি। বরং অনেক বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে,

جاء رجل الى على بن ابى طالب فقال انى طلقت امرأتى الفا قال بانت منك بثلاث اقسم سائرهن بين نسائك

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিয়েছি। প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, তিন তালাকের কারণে তোমার স্ত্রী তালাকে বাইন (এমন তালাক যার পর বিবাহ দোহরানো বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।) হয়ে গেছে। অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্য স্ত্রীদের ওপর বণ্টন করে দাও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩-১৪, সুনানে দারে কুতনী ২/১৪৩৩)

স্পষ্ট কথা যে, পূর্বোক্ত কথা হযরত আলী (রা.)-এর অতিমাত্রার রাগেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিন তালাকের অধিক তালাক অন্য স্ত্রীর ওপর বণ্টন করার কথা কোনো ইমামই বলেন না। অনুরূপভাবে যেসব সাহাবী একের অধিক প্রদত্ত তালাক পতিত হয় মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছে, তাদের ফাতাওয়াকেও রাগ এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ এক সময়ে একের অধিক তালাক দিলে তা পতিত হবে না। যেসব বর্ণনায় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এ কথা বর্ণিত আছে, তিনি একের অধিক তালাক পতিত হয় বলে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন, এ পদক্ষেপ নেয়ার কারণও শুধুমাত্র এটাই যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে উদাসীনতা, বেপরোয়াভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। অন্য কিছু (তথা বাস্তবে তালাক পতিত হওয়া) নয়। (পৃ. ৪১)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদিও এ ধরনের তালাক পতিত হওয়ার ঘটনা অনেক সাহাবী থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত

আছে। কিন্তু এ ধরনের ফাতাওয়া থেকে কস্মিনকালেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ফাতাওয়া প্রদানকারী এ ধরনের তালাককে কুরআন-সুন্নাত অনুযায়ী মনে করে। বিভিন্ন কিতাবে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, অনেক সাহাবী যদিও তিন তালাক একসাথে পতিত হয় মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা এ কথাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, একসাথে তিন তালাক পতিত হওয়া, এটি কুরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, অকাট্য হারাম এবং অবৈধ। (পৃ. ৪২)

মুহাম্মদ ইসমাঈল সালফী, লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা। তার রচিত ফাতাওয়ায়ে সালফিয়্যাহ নামক গ্রন্থে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন যে,

كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

হযরত ইবনে উমর (রা.) হজ এবং উমরা করার পর দাড়ির যে অংশ একমুষ্টির বাইরে চলে যেত, তা কেটে ফেলতেন। (জামিউস সহীহ ১/ ২৭২)

সাধারণভাবে সব সাহাবী বিশেষভাবে হযরত ইবনে উমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে আপসহীন এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তার এই কাজটি হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (পৃ. ১০৭)

তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও নিজেদেরকে সাহাবীপ্রেমিক বলে দাবি করে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়,

কিন্তু আমরা তাদেরই রচিত গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের আসল ভয়ংকর চেহারা উম্মাহর সামনে উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছি। তারা নিজেদেরকে যতই মনোহরী মোড়কে উপস্থাপন করুক না কেন, তাদের ভেতর যে ভয়ংকর এবং কুৎসিত কালো বিড়াল বসবাস করে, আমরা তাদের সেই থলের বিড়াল বের করতে সামান্য প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। এত দীর্ঘ সাতকাহনের অবতারণা এ জন্য করতে হলো, যেন সম্মানীত শ্রোতাবৃন্দ অনুধাবন করতে পারেন যে, আমাদের সাথে লা-মাযহাবীদের বিরোধ কি কয়েকটি মুষ্টিমেয় মাসআলায়? না মূল আক্বীদায়? ইসলাম ধর্মে সাহাবীদের স্থান কোথায়? আর তারা সাহাবীদেরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকে? ইতিহাসের অনির্ভরযোগ্য এবং বানোয়াট বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রাসূল (সা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবীগণকে কি ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়? না তাদের পরিমাপ করতে হলে প্রয়োজন কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথর?

আশা করি, শ্রোতাবৃন্দ বিষয়গুলোর সঠিক জবাব পেয়েছেন। সামনের সংখ্যা থেকে তাদের সাথে বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ :
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-২

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

الشيخ ناصر الدين الالبانى شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء الاسلام ولا يحابى فى ذلك أحدا كائنا من كان ، فتراه يوهم البخارى ومسلما ، ومن دونهما ، ويغلط ابن عبد البر وابن حزم والذهبى وابن حجر والصنعانى ، ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء ان الالبانى نبغ فى هذا العصر نبوغا يندر مثله

"শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের ভুল ধরার ব্যাপারে চরম বেপরোয়া। এ পথে তিনি কাউকেই মুক্তি দেননি। আপনি দেখবেন! সে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিমসহ অপরাপর ইমামদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্দুল বার (রহ.), ইবনে হাযাম (রহ.), ইমাম যাহাবী (রহ.) ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.), ইমাম সানআনী (রহ.)সহ আরো অনেককে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ অনেক অজ্ঞ এবং সাধারণ আলেম তাঁকে বর্তমান যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব মনে করে থাকেন।"

(আল-আলবানী, শুযুযুহু ও আখতাউহু, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯)

বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ সমস্ত ভ্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিতাব লিখেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো–

১.শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)। তাঁর রচিত কিতাবের নাম-

الألبانى شذوذه وأخطاؤه

২. উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল-গুমারী (রহ.)। তাঁর কিতাবের নাম হলো-

"القول المقنع فى الرد على الألبانى المبتدع"

৩.শায়েখ আব্দুল আযীয গুমারী-

"بيان نكث الناكث المقعدى بتضعيف الحارث"

৪.শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-খাজরাযী

"الألبانى تطرفاته"

৫. উস্তাদ বদরুদ্দিন হাসান দিয়াব দামেশকী-

"أنوار المصابيح على ظلمات الألبانى فى صلاة التراويح"

৬. শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল-হারারী,

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث

৭. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)

"أينَ يضع المصلى يده فى الصلاة بعد الرفع من الركوع"

৮. শায়েখ ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আনসারী (রহ.)

"تصحيحُ حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألبانى فى تضعيفه"

৯. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)

"كلماتٌ فى كشف أباطيل وافتراء ات"

১০. শায়েখ হাসান ইবনে আলী আস-সাক্কাফ

قاموس شتائم الألبانى وألفاظه المنكرة فى حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم

১১.শায়েখ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ,

"البشارةُ والإتحاف فيما بين ابن تيمية والألبانى فى العقيدة من الاختلاف"

এখানে সামান্য কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো।

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্ত বিষয়গুলোর সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ অধিকাংশ আলেম স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। "সাবাতু মুয়াল্লাফাতিল আলবানী"-এর গ্রন্থকার এ ধরনের ৫টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত গ্রন্থে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্তিগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের মধ্যে যারা শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর এ সমস্ত ভ্রান্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)।
২. শায়েখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ (রহ.)।
৩. ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ।
৪. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আদ-দাবীশ (রহ.)
৫. সফর বিন আব্দুর রহমান।
৬. মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান সা'আদ।
৭. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মা'নে আল-উতাইবি।
৮. শায়েখ ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুনাইদ।
৯. আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা আল-আদাবী।

জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ-এর দাওয়া বিভাগের প্রধান ড. আব্দুল আযীয আল-আসকার শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে লিখেছেন,

الألبانى واتباعه ليسوا سلفية

"আলবানী এবং তার অনুসারীরা মূলত সালাফী নয়"

অর্থাৎ এরা সালাফী (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হওয়ার দাবি করে; কিন্তু বাস্তবে এরা সালাফী নয়।

(জারিদাতু উকায, মাজালুর রায়, http://www.soufia.org/alalbany_as kar.html)

সুতরাং ডা. জাকির নায়েক যাদেরকে

অনুসরণ করছেন, যাদের মতাদর্শ সমাজে প্রচার করছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যেমন সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট সংশয় রয়েছে, তেমনি কেউ যদি তাদের মতাদর্শ প্রচার করে, তবে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা অনুমেয়।

অতএব, সর্বশেষ কথা হলো, তাবেয়ী ইবনে সিরিন (রহ.) বলেছেন,

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লক্ষ রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।" (নববী ১/৮৪)

চার মাযহাবের অনুসরণ :

প্রচলিত একটি ভুল ধারণা

What is Taqleed _ Taqleed kia hai নামক এক সাক্ষাৎকারে ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়,

اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ھیں آپ یہ فرمائے کہ اس مقلدانہ ذھنیت دین کو فایدہ پہنچایا ھے یا نقصان

অর্থাৎ বর্তমান পুরো বিশ্বের অধিকাংশ লোক তাকলীদের তথা মাযহাব অনুসণের মনোভাব পোষণ করছে, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? মাযহাব অনুসরণের এ মনোভাব কি মুসলিম উম্মাহের উপকার করেছে, নাকি তা তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে?

ডা. জাকির নায়েক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

نقصان پہنچایا ھے میرے حساب سے زیادہ نقصان پہنچایا ھے

অর্থাৎ "মাযহাব অনুসরণ তাদেরকে ক্ষতি করেছে। আমার মতে অনেক ক্ষতি করেছে।"

(http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7PO)

ডা. জাকির নায়েক আরো বলেছেন,

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki.

"অর্থাৎ "মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে।"

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

ডা. জাকির নায়েক এখানে চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণের বিষয়কে "প্রচলিত ভুল ধারণা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ডা. জাকির নায়েকের এ কথার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ডা. জাকির নায়েক যাকে প্রচলিত ভুল ধারণা বলছেন, সে সম্পর্কে দীর্ঘ বার-তেরশ' বছর যাবৎ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসিরগণের অভিমত উল্লেখ করা হলো–

"মানাকেবে আহমাদ" নামক কিতাবে আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, "মাইমুনী (রহ.) বলেছেন, ইমাম আহমাদ আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيه إمام

"হে আবুল হাসান! যে মাসআলায় তোমার কোনো ইমাম নেই, সে মাসআলা থেকে তুমি বেঁচে থাকো।"

[মানাকেবে আহমাদ, আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) পৃষ্ঠা-১৭৮]

"আখবার আবি হানিফা" নামক কিতাবে আল্লামা সুমাইরী (রহ.) ইমাম যুফার (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুফার (রহ.) বলেছেন,

إنى لست أناظر أحدا حتى يقول قد أخطأت، ولكنى أناظره حتى يجن ، قيل :كيف يجن؟ قال :يقول بما لم يقل به أحد

"অর্থাৎ কেউ ভুল স্বীকার করলেও তার সাথে আমি ইলমী আলোচনা করতে থাকি, যতক্ষণ না সে পাগল হয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে পাগল হয়? তিনি উত্তর দিলেন, "এমন মতামত পেশ করে, যা কেউ কখনো বলেনি।"

[আখবার আবি হানিফা, আল্লামা সুমাইরী (রহ.), পৃষ্ঠা-১১০]

আল্লামা যারকাশী (রহ.) "বাহরে মুহীত" নামক কিতাবে লিখেছেন,

والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد عن مذاهب الأربعة وقد وقع الإتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر فى هذه الأربعة، و حينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الإجتهاد إلا فيها

"স্বীকৃত বিষয় হলো, বর্তমান যুগে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) নেই। তবে সংশ্লিষ্ট মাযহাবে মুজতাহিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হক্ব এই চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয় এবং এই চার মাযহাবের ওপরই কেবল ইজতেহাদ করা যাবে।"

[আলবাহরুল মুহীত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪০]

আল্লামা নাফরাবী (রহ.) লিখেছেন,

وقد إنعقد إجماع مسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة :أبى حنيفة ، ومالك و الشافعى وأحمدبن حنبل رضى الله عنهم و عدم جواز الخروج عن مذاهبهم

অর্থাৎ "বর্তমান মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, চার মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা,

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এগুলোর কোনো একটি অনুসরণ করা জরুরি। মুসলিম উম্মাহের মাঝে এ ব্যাপারেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ চার মাযহাব থেকে বের হয়ে অন্য কোনো মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয নেই।"

"মারাকিস সুউদ" নামক কিতাবের গ্রন্থকার লিখেছেন,

و المجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجميع منعه

"বর্তমানে চার মাযহাবের ওপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য যেকোনো মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে সকলেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।"

আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহ.) লিখেছেন,

فى الإفصاح :إن الإجماع إنعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة و أن الحق لا يخرج عنهم

"অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে এবং চার মাযহাবের মাঝেই সত্য নিহিত রয়েছে।"

[আল-ফুরু, আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহ.) খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭৪]

আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহ.) "আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

ذكر بعض المتأخرين و هو ابن الصلاح منع تقليد غير أئمة الأربعة: أبى حنيفة و مالك و الشافعى و أحمد رحمهم الله

"পরবর্তী উলামাগণ যেমন আল্লামা ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রহ.) ব্যতীত অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়।"

[আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহ.) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭২]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর মুকাদ্দামায় লিখেছেন,

ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة و درس المقلدون لمن سواهم و سد الناس باب الخلاف و طرقه لما كثر تشعب الإصطلاحات فى العلوم و لما عاق عن الوصول إلى رتبة الإجتهاد ولما خشى من إسناد ذلك إلى غير أهله و من لا يوثق برأيه و لا بدينه فصرحوا بالعجز و الإعواز و ردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من إختص به من المقلدين و حظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم...ومدعى الإجتهاد لهذا العصر مردود على عقبه مهجور تقليده و قد صارأهل الإسلام اليوم على هؤلاء الأربعة

"অর্থাৎ বর্তমানে সমস্ত শহরে শুধু এ চার মাযহাবেরই অনুসরণ করা হয় এবং এর অনুসারীগণ অন্যদেরকে এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর মানুষ এ ব্যাপারে মতানৈক্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হলো, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় নিত্যনতুন পরিভাষা সৃষ্টি। আর যখন মানুষ "ইজতেহাদ"-এর স্তরে উন্নীত হওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং ইজতেহাদের বিষয়ে অযোগ্য ও দ্বীনের ব্যাপারে আস্থাহীন লোকদের হস্তক্ষেপের ভয় করল, তখন তারা নিরূপায় হয়ে মানুষকে এ চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণের নির্দেশ দিল এবং চার মাযহাবের ক্ষেত্রে রদবদল বা তালফীক করা থেকে মানুষকে সতর্ক করল। কেননা এটি দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করারই নামান্তর। সুতরাং এ যুগে কেবল এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসাইলই চর্চা করা হয়। এ যুগে কারো "মুজতাহিদ" হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে, সুতরাং এ ধরনের দাবিদারের অনুসরণও নিষিদ্ধ। বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ এ চার মাযহাবের ওপরই একমত হয়েছেন।"

[মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৩]

আল্লামা যারকাশী (রহ.) "বাহরুল মুহীত-এ লিখেছেন,

الدليل يقتضى إلتزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة

অর্থাৎ দলিলের দাবি হলো, চার ইমামের পরে কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরি।

[আলবাহরুল মুহিত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন,

"إن أراد أنى لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطء فى الغالب قطعا إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة فى عامة الشريعة"

অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনোটিকেই অনুসরণ করব না বরং তার বিরোধিতা করব, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাসআলার বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।

(ফতাওয়ায়ে মিসরিয়্যা লি ইবনে তাইমিয়া পৃ. ৮১)

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "সিয়ার আ'লামিন নুবালা"-এ লিখেছেন,

لا يكاد يوجد الحق فيما إتفق أئمة الإجتهاد الأربعة على خلافه

"চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের বিপরীতে কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', আল্লামা যাহাবী (রহ.), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৭]

আল্লামা মুনাবী (রহ.) "ফায়যুল কাদীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

فيمتنع تقليد غير الأربعة فى القضاء و الإفتاء لأن المذاهب الأربعة إنتشرت و تحررت

অর্থাৎ বিচার ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর সব কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

[ফায়যুল কাদীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০]

মাযহাবের ব্যাপারে আব্দুল ওহাব নজদী (রহ.)-এর অভিমত :

"ونحن أيضا فى الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلَّد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرُّهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة .ولا نستحقُّ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها،

"শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। আমরা চার মাযহাবের অনুসারী কারো প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব রাখি না। তবে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাবের ব্যতিক্রম। কেননা সে সমস্ত মাযহাব সুশৃঙ্খলভাবে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যেমন–রাফেযী, যায়দী, ইমামিয়া ইত্যাদি এবং আমরা তাদের ভ্রান্ত মাযহাবসমূহের স্বীকৃতিও প্রদান করি না। বরং আমরা তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনকে অনুসরণ করতে বাধ্য করি।

আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইজতেহাদের যোগ্য নই এবং আমাদের কেউ এর যোগ্য হওয়ার দাবিও করে না।"

[আদ্-দুরারুস সুন্নিয়াহ্ মিনাল আজয়িবাতিন নজদিয়্যা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৭]

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় আরো অনেক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে যুগশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত আলেমের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

যুগশ্রেষ্ঠ এ সমস্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য যদি ভুল ধারণা হয়, তবে ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য যে কোন স্তরের, তা সহজেই অনুমেয়। যুগশ্রেষ্ঠ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণের বক্তব্যের সাথে বর্তমান সময়ের ডা. জাকির নায়েক কিংবা অন্য কোনো গাইরে মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসের বক্তব্য তুলনা করুন। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর তুলনায় কিছুই নন। আর আমরা বলব, এখানে যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফতী, ঐতিহাসিকগণের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের একজনের তুলনায় নাসীরুদ্দিন আলবানীও কিছুই নন।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ মুহাদ্দিসগণ যাকে ওয়াজিব বলছেন, ডা. জাকির নায়েক তাকে বলছেন, ভুল ধারণা। উলামায়ে কেরাম যাকে সফলতার কারণ বলছেন, ডা. জাকির নায়েক তাকে বলছেন, এটি মুসলিম উম্মাহের ক্ষতির কারণ।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহের। কাদের কথা গ্রহণ করা উচিত আর কাদের পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রহ.)-এর সেই কালজয়ী উক্তি–

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লক্ষ রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।"

[মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, আল্লামা নববী (রহ.) কর্তৃক রচিত। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৪]

লা-মাযহাবী মতবাদ সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন

১। মাযহাব মানি কেন
২। তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ
৩। তারাবীর নামায ২০ রাক'আত কেন
৪। ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন
৩। সহীহ শুদ্ধ নামায

প্রাপ্তিস্থান

আল-আবরার লাইব্রেরী, বসুন্ধরা, ঢাকা।
জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
জামিয়া ইসলামিয়া, মাইজদি।
শুলকবহর মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
চাকমারকুল মাদরাসা, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : চাকরি

আব্দুল আজিজ চৌধুরী
ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা-১২০৬।

জিজ্ঞাসা

হোটেল সোনারগাঁও, রূপসী বাংলা ও র‍্যাডিসন প্রভৃতির মতো আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের প্রশাসনিক, মানবসম্পদ বা হিসাব বিভাগে চাকরি করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানতে চাই। উল্লেখ্য, এসব হোটেলে পহেলা বৈশাখ, থার্টিফার্স্ট নাইট প্রভৃতি উপলক্ষে নানা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চলে। মদের ক্রয়-বিক্রয়, নৃত্যশালা ইত্যাদি।

সমাধান

মুসলমানের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা কোনোভাবেই উচিত নয়, যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশ আমদানি হালাল হলে প্রশ্নোল্লিখিত পদে চাকরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন হালাল বলে গণ্য হবে। নতুবা নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৭৭, ফাতাওয়া রহিমিয়া ১০/৩৩২)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা: জসিমুদ্দীন
খিলক্ষেত নামাপাড়া, ঢাকা-১২২৯।

জিজ্ঞাসা :

মাদরাসার জন্য ২ কাঠা জায়গা ওয়াকফ করে সেখানে ৩ তলাবিশিষ্ট ভবন তৈরি করে অদ্যবধি মাদরাসার কার্যক্রম চলছে। উক্ত মাদরাসার পাশে মসজিদ না থাকায় ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকাবাসীর নামাজের কষ্ট হচ্ছে। মাদরাসার ওয়াকফকারীগণ এ সমস্যা উপলব্ধি করে মাদরাসাসংলগ্ন পূর্ব পাশে মাদরাসার দৈর্ঘ্য বরাবর দেড় কাঠা জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। এলাকার বসতি অধিক হওয়ার কারণে এ অল্প জায়গার মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান হবে না বলে দাতাগণ মনে করছেন। এ কারণে ওয়াকফকারীগণ একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, প্রস্তাবিত মসজিদের নিচতলা মসজিদ ও মাদরাসার কাজের জন্য রেখে মসজিদের দ্বিতীয় তলার সাথে মাদরাসার দ্বিতীয় তলা সংযোজন করে মসজিদ নির্মাণ করতে চান। প্রয়োজনে মাদরাসার উপরের তলাগুলোও মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে চান। উপরে উল্লিখিত প্রস্তাব শরীয়তসম্মত হবে কি না বা কিভাবে করলে শরীয়তসম্মত হবে?

সমাধান :

ওয়াকফকৃত মাদরাসা ভবনের কোনো অংশকে মসজিদে রূপান্তরিত করা যাবে না। মসজিদের প্রয়োজন মেটাতে মসজিদের নামে ভিন্ন করে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি ওয়াকফ করে বহুতলবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৯০, কিফায়াতুল মুফতী ৭/৫৯০)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুফতী জুলকার নাইন সুহাইল
মহাখালী ওয়্যারলেস গেট, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

মূল মসজিদের সাথে মেসের জায়গায় ইমাম সাহেবের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার বানানো জায়েয হবে কি না? পরিবারসহ থাকতে পারবেন কি না?

জিজ্ঞাসা-২

মূল মসজিদ থেকে সামনের অংশে মসজিদের মেহরাবের উপরের অংশে মসজিদের ইনকামের জন্য মেস বানানো জায়েয আছে কি না?

জিজ্ঞাসা-৩

মূল মসজিদ থেকে সামনের অংশে যেথায় মেস হবে। সেই মেসে প্রবেশ করার জন্য মেস মেম্বারগণ মূল মসজিদের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে পারবেন কি না?

সমাধান-১

মসজিদসংলগ্ন (মূল মসজিদ থেকে পৃথক) উক্ত মেসের জায়গায় ইমাম সাহেবের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার বানানো জায়েয হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭৯)

সমাধান-২

শরয়ী মসজিদের মেহরাব এবং তার ওপর আকাশ পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে বিবেচিত। তাই তার ওপর মেস বা অন্য কোনো কিছু বানানো জায়েয হবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/২০৮)

সমাধান-৩

উক্ত মেসে প্রবেশ করার জন্য মেস মেম্বারগণ মসজিদের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে পারবেন না। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৫/৪২০)

প্রসঙ্গ : যিকির

মাওলানা আব্দুল্লাহ
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা-১

মাসের নির্দিষ্ট তারিখে এলান করে

পরস্পরে ডাকাডাকি করে মাগরিবের পরে আওয়াবীন নামায আদায়ান্তে সকলে মিলে সমবেত হয়ে, তালে তালে, মাথা ঝাঁকিয়ে, আলো-বাতি বন্ধ করে, সমস্বরে, উচ্চ আওয়াজে যিকির করা, (উচ্চ আওয়াজ এ পরিমাণ যে, পাঁচ শতাংশ জমির ওপর অবস্থিত মসজিদের কোনো স্থানে নামায আদায় করা সম্ভব নয়) যিকির শেষে মুনাজাত ও খানাপিনার ব্যবস্থা থাকে, এমন যিকির করা যাবে কি না? আমরা শুনেছি, নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামগণ কখনো এরূপ যিকির করেননি, এ কথাটি কি সঠিক?

জিজ্ঞাসা-২

জলী যিকির ও খফী যিকির কাকে বলে? ফযীলতের দিক থেকে কোনো পার্থক্য আছে কি না এবং কোনটির কী হুকুম?

জিজ্ঞাসা-৩

কোনো শাইখ বা পীরের খলীফা ও মুজাযগণের জন্য হুবহু শাইখের সুর নকল করে বয়ান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

জিজ্ঞাসা-৪

মাহফিলে বা কোনো দ্বীনি বয়ানের মজলিসে মাইকে লিড দিয়ে যিকির করার হুকুম কী?

সমাধান-১

কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়ত যেকোনো ইবাদত বা আমলের জন্য নিয়মনীতি ও রূপরেখা এবং সময় নির্ধারণ করলেও যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি এবং সময় নির্ধারণ করেনি বরং যেকোনো সময় যেভাবে সম্ভব একাকী বা সম্মিলিত নিঃশব্দে বা স্বশব্দে ঘরে বা মসজিদে যথাসম্ভব বেশি বেশি যিকির করার প্রতি আদেশ ও উৎসাহিত করেছে, তবে শর্ত হলো নামাযী ব্যক্তির নামায বা ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত না হওয়া এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হওয়ার মতো বিকট শব্দ না করা এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে ইবাদত বা জরুরি মনে না করা এবং যারা ঐ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদেরকে হেয় মনে না করা বরং তাদের পদ্ধতিকেও সঠিক মনে করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সুরে সুর বা তালে তাল মিলানো থেকে বিরত থাকা। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত নির্দিষ্ট তারিখ ও যিকিরের পদ্ধতিকে আবশ্যক মনে না করা এবং স্বেচ্ছায় তালে তাল মিলানো ও সমস্বরকে পরিহার করার শর্তে অনুমতি দেওয়া যায়।

তবে বিজ্ঞ কোনো আলেমের তত্ত্বাবধান ছাড়া সাধারণের জন্য এ ধরনের যিকিরের আয়োজন শেষ পর্যন্ত বিদআতের রূপান্তরিত হয় তাই প্রথম থেকেই আশঙ্কা মুক্ত রাখা দরকার। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৬০, এমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২১৮)

সমাধান-২

কারো পরিভাষায় কলবী যিকিরকে খফী ও মৌখিক যিকিরকে জলী বলা হয়। আর কারো মতে উভয়টি মৌখিক যিকির তবে খফী যা নিঃশব্দে করা হয় আর জলী যা শব্দ করে করা হয়। রিয়া তথা লোক দেখানোর ভাব সৃষ্টির আশঙ্কা হলে অথবা ঘুমন্ত বা নামাযীদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হলে খফী যিকির উত্তম, অন্যথায় জলী যিকির উত্তম, তবে খফী যিকির সর্বাবস্থায় আশঙ্কামুক্ত। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৫১, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৩৪২)

সমাধান-৩

বয়ান নিজ সুরে হওয়াই বাঞ্চনীয়, ইচ্ছাকৃত কোনো পীরের মুরীদ নিজ পীরের সুর নকল করা অনুচিত। (সুনানে তিরমিযী ২/১১২)

সমাধান-৪

মাইকে লিড দিয়ে যিকির করা জায়েয নেই। (খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৫০)

প্রসঙ্গঃ তারাবীহ

আব্দুর রশীদ
কুড়িল, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : তারাবীর নামায কত রাক'আত পড়া সুন্নাত? আমরা সবসময় ২০ রাকআত তারাবীই পড়ে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি অনেকে বলে তারাবীর নামায নাকি আট রাক'আত। এব্যাপারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান : তারাবীর নামায বিশ রাকআত পড়াই সুন্নাত। এর কম বেশী করার সুযোগ নেই। যারা আট রাকআত বলে তারা হয়ত জাহেল অথবা বদদীন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৯৪ হা. ৭৭৭৪, সুনানে কুবরা বাইহাকী ১/২৬৭-২৬৮) (এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী লিখিত "তারাবীর নামায বিশ রাকআত কেন")

প্রসঙ্গ : হালাল-হারাম

জনৈক ব্যক্তি
বারিধারা, ঢাকা ।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি অফিসে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। ইন্টারভিউয়ের পর কর্তৃপক্ষ আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বর্তমান কোম্পানিতে কত বেতন পান? আমি বললাম ৩০০০০ টাকা।

উল্লেখ্য, প্রত্যাশিত কোম্পানিতে কাঙ্ক্ষিত পদের পরিশ্রম সাপেক্ষে বেতন ৩০০০০ থেকে ৩৫০০০ টাকা যুক্তিযুক্ত, যা প্রকৃত বেতন (২২০০০ টাকা) বললে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া কম বেতন বললে অবমূল্যায়নের সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্ন হলো, উক্ত বেতন/বেতনাংশ হালাল হবে কি না। উক্ত বেতন দিয়ে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করলে ইবাদত কবুল হবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে চাকরির বেতন হালাল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হলো, কোম্পানির কার্যক্রম শরীয়তসম্মত হওয়া এবং চাকরিজীবী নিয়োজিত কাজের যোগ্য হওয়া। বেতন নির্ধারণ কোম্পানির ঐচ্ছিক ব্যাপার। চাকরিজীবীর যোগ্যতার দিকে লক্ষ করে যে পরিমাণ বেতন নির্ধারণ করবে চাকরিজীবী তাতে সম্মত হলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার পর বেতন হালাল হবে। তবে সাবেক বেতনের ব্যাপারে ভুল তথ্য দেওয়া মিথ্যার শামিল, যার জন্য সকাতরে তাওবার বিকল্প নেই। (সূরা হজ্ব, জামিউত তিরমিযী ২/১৮)

প্রসঙ্গ : বিত্র নামায

শামসুল আলম

সৈয়দপুর, নিলফামারী।

জিজ্ঞাসা : বিতর নামায কত রাক'আত? কত সালামে? কুনুত রুকুর আগে না পরে? এক রাক'আত বিতর পড়ানে ওয়ালা ইমামের পিছনে বিতর নামাযের ইক্তিদা সহীহ হবে কি না? বিস্তারিত জানাবেন।

সমাধান : বিতর নামায তিন রাক'আত এক সালামে পড়তে হবে। এর ব্যতিক্রম পড়লে বিতর নামায আদায় হবে না। দু'আ কুনুত রুকুর পূর্বে পড়া ওয়াজিব। পরে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু এক রাকআত বিতর শুদ্ধ নয়, তাই এক রাক'আত বিতর পড়ানে ওয়ালা ইমামের পিছনে বিতর নামাযের ইক্তিদা করা বৈধ হবে না। (বুখারী ১/২৬৯ হা. ২০১৩, তিরমিযী ১/১০৬ হা. ৪৬৩, বুখারী ২/৫৮৭ হা. ৪০৯৬, মুসলিম ১/২৩৭ হা. ৬৭৭)

প্রসঙ্গ : বিনিয়োগ

মুহা: সেলিম আহমদ

বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা-১

আমি নিজ তহবিল থেকে মুনাফার জন্য বিশ্বস্ত লোকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকি। ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকা না দিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে কোনো পণ্য (ধান, চাল, আটা ইত্যাদি পণ্য বস্তা হিসেবে) কিনে মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট মেয়াদে কিস্তিতে অথবা মেয়াদান্তে সকল টাকা পরিশোধের শর্তে পণ্য প্রদান করে থাকি। উক্ত ঋণগ্রহীতার পণ্যের প্রয়োজন না থাকলে তিনি পণ্য পুনরায় অন্যত্র বিক্রি করে দিতে পারেন। উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে একই পণ্য তিনবার বিক্রি করা হচ্ছে। এবং সর্বাবস্থায় পণ্য স্ব-স্থানে থাকছে। তবে পণ্য যেমন এক লাখ টাকায় ৫০ বস্তা চাল চিহ্নিত করা হয়। এখন জানার বিষয় হলো, উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

সমাধান-১

পণ্য ক্রয় করার পর দ্বিতীয় বার বিক্রয় করতে চাইলে স্বীয় পণ্যের ওপর কব্জ তথা পরিপূর্ণ দখল অর্জিত হওয়া শর্ত, যা প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে অনুপস্থিত। তাই আপনার বর্ণিত বিনিয়োগ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। উল্লেখ্য, উক্ত পঞ্চাশ বস্তা চাল ক্রেতার জিম্মায় দিয়ে দিলে এবং ক্রেতা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিক্রি করার অধিকার লাভ করলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (সহীহুল বুখারী ১/২৮৬)

প্রসঙ্গ : নামায

জিজ্ঞাসা-২

আমি শুনেছি যে নামাযীর পাশে উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। তাহলে যখন পেছনে মাসবুক নামায পড়ে তখন ইমামের উচ্চ আওয়াজে মুনাজত করা সহীহ হবে কি না?

সমাধান-২

নিম্ন স্বরে দু'আ করা উত্তম। কখনো উচ্চ স্বরে দু'আ করতে চাইলে নামাযী ব্যক্তির নামাযে ব্যাঘাত না হওয়ার বিষয়টি লক্ষ রাখা আবশ্যক। (সূরা আ'রাফ-৫৫)

প্রসঙ্গ : হালাল-হারাম

জিজ্ঞাসা-৩

খরগোস খাওয়া জায়েয কি না? কেহ কেহ বলে যেটার পা বকরির পায়ের মতো সেটা খাওয়া জায়েয আর যেটার পা বিড়ালে পায়ের মতো সেটা নাজায়েয।

সমাধান-৩

উভয় প্রকার খরগোস খাওয়া জায়েয। (সহীহে মুসলিম ২/১৫২)

প্রসঙ্গ : জুমুআ

মাও. আব্দুল আওয়াল

উত্তর বেগুনবাড়ী তেজগাঁও ঢাকা-১২০৮।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশে জুমু'আর পূর্বে মুসল্লীদের উদ্দেশে যে বয়ান হয় উক্ত বয়ান শুরু করার পূর্বে মুসল্লিদেরকে মাইকে সালাম দেয়ার প্রসঙ্গে খতীব সাহেবের কতটুকু দায়িত্ব জানতে চাই।

সমাধান :

বয়ানের পূর্বে সালাম দেয়া জায়েয। তবে সুন্নাত মনে করে দেবেন না। (আসসুনান ৮/৬৬)

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং
২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক
হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩